মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী

উৎপাদক শ্রম

গান্ধী স্মারক নিধি
বাংলা

মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী

উৎপাদক শ্রম

শ্রীশম্ভুনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় অনূদিত

পরিবেশক
সর্বোদয় প্রকাশন সমিতি
সি-৫২, কলেজ স্ট্রীট মার্কেট
কলিকাতা-১২

প্রকাশক : শ্রীশক্তিরঞ্জন বসু
সম্পাদক, গান্ধী স্মারক নিধি (বাংলা)
১৪, রিভারসাইড রোড,
বারাকপুর (২৪-পরগনা)

কলিকাতা কেন্দ্র :
প্রকাশন বিভাগ, গান্ধী স্মারক নিধি (বাংলা)
১২ডি, শঙ্কর ঘোষ লেন, কলিকাতা-৬

প্রথম প্রকাশ : পৌষ ১৩৭০ (ডিসেম্বর ১৯৬৩)

মুদ্রণ : ৩৩০০

প্রচ্ছদ-শিল্পী : শ্রীসুমুখ মিত্র

মূল্য : ৬০ ন. প.

মুদ্রক : শ্রীদ্বিজেন্দ্রলাল বিশ্বাস
ইণ্ডিয়ান ফোটো এনগ্রেভিং কোং প্রাঃ লিঃ
২৮, বেনিয়াটোলা লেন,
কলিকাতা-৯

'**Utpadaka Srama**' is the Bengali translation of the booklet in the Navajivan series 'Bread Labour' by Mahatma Gandhi. It puts forward succintly the many benefits of manual labour in the life of an individual and underlines its supreme importance towards the development of a total personality.

Published by the permission of the Navajivan Trust.

গান্ধী স্মারক নিধি (বাংলা)-র প্রকাশিত পুস্তকাবলী

মহাত্মা গান্ধী	৬·৫০ / ৫·৫০
সর্বোদয়	২·৫০
অছিবাদ	০·৬২
পঞ্চায়েত রাজ	০·৭৫
গীতাবোধ	১·৫০
নারী ও সামাজিক অবিচার	৪·০০
পল্লী-পুনর্গঠন	৩·০০
সত্যই ভগবান	৩·৫০
কর্মের সন্ধান	০·৭৫
সর্বোদয় ও শাসনমুক্ত সমাজ	২·৫০

প্রথম পরিচ্ছেদ

একটি পুস্তকের যাদু-প্রভাব

[গান্ধীজী তাঁহার আত্মজীবনীর একটি অধ্যায়ে রাস্কিনের লেখা 'আনটু দিস্ লাস্ট' (Unto This Last) নামক পুস্তক তাঁহার মনে কী গভীর প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল পাঠকদের তাহা বলিয়াছেন। দক্ষিণ আফ্রিকায় তাঁহার সহকর্মী শ্রীএইচ. এস. এল. পোলক গান্ধীজীর জোহানেস্‌বার্গ হইতে ডার্বান যাওয়ার পথে পড়িবার জন্য বইখানি তাঁহাকে দিয়াছিলেন। এ ঘটনা ঘটিয়াছিল ১৯০৪ সালে।]

বইখানি পড়িতে আরম্ভ করিয়া আর থামিতে পারি নাই, ইহা আমার সমগ্র মনকে আকর্ষণ করিতেছিল। জোহানেস-বার্গ হইতে ডার্বান চব্বিশ ঘণ্টার পথ। সারারাত ঘুমাইতে পারিলাম না। মনে মনে সংকল্প করিলাম, এই পুস্তকে যে আদর্শের কথা বলা হইয়াছে তদনুসারে নিজের জীবনের গতি পরিবর্তিত করিতে হইবে। রাস্কিনের লেখা বই আমি ইহার পূর্বে আর পড়ি নাই। লেখাপড়া শেখার সময় পাঠ্যপুস্তকের বাহিরে আমি বিশেষ কিছু পড়ি নাই। কার্যক্ষেত্রে প্রবেশ করিয়া আর পড়ার সময়ই পাই নাই। ফলে বই পড়ার অভিজ্ঞতা ছিল আমার যৎসামান্য। কার্যগতিতে বই পড়ার পরিমাণ কম হওয়াতে আমার বিশেষ ক্ষতি হইয়াছে বলিয়া মনে হয় না। বরঞ্চ পড়ার পরিমাণ কম ছিল বলিয়া অধীত বিষয় সম্যক্ গ্রহণ ও পরিপাক করিতে পারিয়াছি বলিয়া

বিশ্বাস করি। যে কয়খানি বই আমি অধ্যয়ন করিয়াছি তাহার মধ্যে যে পুস্তক পড়া মাত্রই আমার জীবনে বাস্তবিক পরিবর্তন ঘটাইতে পারিয়াছে তাহা এই 'আনটু দিস্ লাস্ট'।

আমার মনে হইল, রাস্কিনের এই সার্থক গ্রন্থে আমার মনের গভীরতম ধারণাগুলিই বিকশিত হইয়া উঠিয়াছে, যাহার জন্য বইখানি আমাকে প্রভাবিত করিয়া নূতন জীবনের সন্ধানে চলার প্রেরণা জোগাইয়াছিল। যিনি কথার শক্তিতে মানুষের অন্তরে নিহিত কল্যাণবুদ্ধিকে জাগাইয়া তুলিতে পারেন তিনিই কবি। কবিরা সকল ব্যক্তিকে সমানভাবে উদ্বুদ্ধ করিতে পারেন না কারণ সকলের চিত্তের বিকাশ সমপরিমাণ ঘটে না।

আমার নিজের বোধ অনুসারে 'আনটু দিস্ লাস্ট' পুস্তকের মূলসূত্র তিনটি—

(১) ব্যক্তির কল্যাণ সর্বজনের কল্যাণের দ্বারাই সাধিত হইতে পারে।

(২) একজন উকিলের ও একজন নাপিতের কাজের মূল্য সমান এবং সকলেরই নিজ নিজ শ্রমের দ্বারা জীবিকা অর্জনের সমান অধিকার আছে।

(৩) শ্রমিকের জীবন, যথা যাহারা কৃষিকার্য করে অথবা নিজের হাতে শিল্পসৃষ্টি করে, তাহাদের জীবনই সর্বোত্তম।

এর মধ্যে প্রথমটি আমার জানা ছিল। দ্বিতীয়টি আমি অল্পবিস্তর ধারণা করিতে পারিতাম। তৃতীয়টি আমি কখনও কল্পনা করিতে পারি নাই। 'আনটু দিস্ লাস্ট' পড়িয়া আমি

দিবালোকের ন্যায় স্পষ্ট দেখিতে পাইলাম যে, দ্বিতীয় ও তৃতীয় সত্য দুইটি প্রথমটির মধ্যেই নিহিত রহিয়াছে। এই সত্য-গুলির সাধনে জীবন নিয়োগ করিবার সংকল্প লইয়া প্রত্যুষে শয্যা ত্যাগ করিলাম।

[আত্মজীবনী, ১৯৫৮ সংস্করণ]

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

অন্ন-যজ্ঞের নীতি

'বাঁচিতে হইলে মানুষকে শ্রম করিতে হইবে', এই নীতি আমি প্রথম উপলব্ধি করি অন্ন-শ্রমের (Bread Labour) বিষয়ে টলস্টয়ের লেখা পড়িয়া। তাহারও পূর্বে রাস্কিনের লেখা 'আনটু দিস্ লাস্ট' (সর্বোদয়) নামক বই পড়ার পর হইতেই আমি এই ধারণার প্রতি শ্রদ্ধা পোষণ করিয়া আসিতেছিলাম। মানুষকে যে তাহার কায়িক পরিশ্রম দ্বারা জীবিকা সংগ্রহ করিতে হইবে, এই ঈশ্বর-নির্দিষ্ট নীতি সর্ব-প্রথম ঘোষণা করেন টি. এম. বণ্ডারেফ নামক একজন রুশ লেখক। টলস্টয় এই নীতি প্রচার করিয়া বহুজনপরিচিত করিয়াছেন। আমার মতে গীতার তৃতীয় অধ্যায়ে, যেখানে বলা হইয়াছে যে যজ্ঞে আহুতি না দিয়া যে ভোজন করে তাহার চুরি করিয়া খাওয়া হয়, সেখানেও এই নীতিই ঘোষিত

হইয়াছে। এই ক্ষেত্রে যজ্ঞ বলিতে অন্নের জন্য শ্রম ছাড়া আর কিছুই বুঝায় না।

বিচারের দ্বারা আমরা একই সিদ্ধান্তে উপনীত হই। যে ব্যক্তি শরীর-শ্রম করে না তাহার আহার করিবার অধিকার জন্মাইবে কিরূপে? বাইবেলও বলেন, "মাথার ঘাম পায়ে ফেলিয়া তুমি জীবিকা সংগ্রহ করিও।" কোটিপতিরাও যদি কেবল বিছানায় গড়াইয়া দিন কাটান এবং যদি আহারের সময়ও তাঁহাদিগকে কষ্ট না দিয়া কেহ খাওয়াইয়া দেয় তাহা হইলে বেশী দিন টিকিতে পারিবেন না—কয়েকদিনের মধ্যেই জীবন দুর্বহ হইয়া পড়িবে। সেইজন্যই তাঁরা নানারূপ ব্যায়ামের দ্বারা ক্ষুধা বৃদ্ধি করিয়া নিজের হাতেই আহার করেন। ইহাতে প্রমাণ হইতেছে, কি ধনী কি দরিদ্র শরীরশ্রম সকলেরই প্রয়োজন।

তাহা হইলে ভূয়া ব্যায়ামে শ্রম না করিয়া কিছু না কিছু সৃষ্টির জন্য শ্রম বা অন্নের জন্য শ্রম করিলে লাভ বই ক্ষতি কোথায়? কৃষি-শ্রমিককে তো কেহ পেশী সঞ্চালন বা শ্বাস নিয়ন্ত্রণের দ্বারা ব্যায়াম করিতে বলে না। দশ ভাগের নয় ভাগ মানুষ কৃষিতে খাটিয়া বাঁচিয়া আছে। বাকী একভাগও যদি নয় ভাগের অনুকরণ করিয়া অন্ততঃ নিজেদের প্রয়োজন মিটানোর জন্যও শ্রম করিতেন তাহা হইলে এই পৃথিবী কত অধিক সুখকর, স্বাস্থ্যকর ও শান্তিময় হইত। এইসব লোক যদি চাষের কাজে হাত লাগাইতেন তাহা হইলে ঐ কাজের মধ্যে যেগুলি দুষ্কর সেগুলিকে সহজসাধ্য করার কৌশলও

আবিষ্কৃত হইত। যদি প্রত্যেকটি মানুষ এই অন্ন-যজ্ঞে আহুতি দিতে স্বীকৃত হইত তাহা হইলে বর্তমান জগতে মানুষের মধ্যে যে ভেদ ও বিরোধ চলিয়াছে তাহার অবসান হইত। এই শ্রমের ধর্ম সকল বর্ণের পক্ষেই পালনীয়। সারা পৃথিবী ব্যাপিয়া আজ পুঁজিপতি ও শ্রমিকের বিরোধ চলিয়াছে, দরিদ্র ধনীকে ঈর্ষা করিতেছে। যদি সকলেই নিজ নিজ প্রয়োজনে শ্রম করিত তাহা হইলে শ্রেণীগত বিরোধ লোপ পাইত। সংসারে ধনীব্যক্তি থাকিত নিশ্চয়ই কিন্তু তাহারা মনে করিত যে তাহারা ধনের অছি মাত্র এবং তাহাদের আয়ের বেশীর ভাগ জনসাধারণের হিতার্থে ব্যয় করিত।

যাহারা অহিংসা ব্রত পালন করিতে চাহে, যাহারা সত্যের পূজারী, যাহারা ব্রহ্মচর্য পালনই ধর্ম বলিয়া জানে, তাহাদের পক্ষে এই শরীরশ্রম পরম সহায়ক বলিয়া গ্রাহ্য হইবে। এই শ্রমের প্রয়োগ কেবল কৃষিকার্যের ক্ষেত্রেই সার্থক হইতে পারে। কিন্তু বর্তমান কালে সকলের পক্ষে কৃষি সম্পর্কীয় কাজে অংশ গ্রহণ করিবার সুযোগ নাই। যেখানে চাষের কাজ করার সুযোগ নাই, সেই ক্ষেত্রে কেহ চরকায় সুতা কাটিবে, কেহ কাপড় বুনিবে, কেহ ছুতারের কেহ কামারের কাজ করিবে। তবে সব সময়ে কাজের ধারা কৃষিকেন্দ্রিক হওয়া চাই। প্রত্যেককেই হইতে হইবে নিজের ঝাড়ুদার। খাদ্য গ্রহণ আমাদের পক্ষে যত প্রয়োজনীয়, মলমূত্র ত্যাগ তাহার অপেক্ষা কম প্রয়োজনীয় নয়। সুতরাং যেমন প্রত্যেকেই নিজ আহার সংগ্রহে যত্নশীল হন, তেমনই নিজ নিজ পরিত্যক্ত

ক্লেদেরও সদ্গতি করিবেন। ইহাই সর্বজনগ্রাহ্য নিয়ম হওয়া উচিত। যেক্ষেত্রে স্বতন্ত্রভাবে প্রতিটি ব্যক্তি এই কাজ করিতে পারিবেন না, প্রতি পরিবার নিজেদের সাফাইয়ের ব্যবস্থা করিবেন। বহুদিন হইতে আমি অনুভব করিয়া আসিতেছি, আমাদের দেশে যে বিশেষ এক শ্রেণীর হাতে সাফাইয়ের দায়িত্ব দেওয়ার ব্যবস্থা রহিয়াছে তাহার মূলে রহিয়াছে অধর্ম। সাফাইয়ের কাজ সমাজের স্বাস্থ্য রক্ষার পক্ষে কত প্রয়োজনীয় তাহা সকলেই জানি। কিন্তু যে সম্প্রদায় নিয়ত এই কাজ করিয়া আমাদের বাঁচিয়া থাকা সম্ভব করিয়াছে, কোন্ ব্যক্তির বিধানে তাহাদের স্থান হইল সমাজে সবার নীচে, ইতিহাসে তাহা লেখে না। সে ব্যক্তি যিনিই হোন না কেন, তিনি আমাদের কল্যাণ করেন নাই। শিশুকাল হইতে আমাদের মনে এই ধারণা বদ্ধমূল হইয়া গড়িয়া ওঠা চাই যে, আমরা প্রত্যেকেই সাফাইকার। যাঁহারা এই ব্রতের মূল্য উপলব্ধি করিবেন তাঁহাদের পক্ষে এই ব্রত প্রচার সবচেয়ে সহজ হইবে, যদি তাঁরা সাফাইয়ের কাজের মাধ্যমে অন্ন-যজ্ঞে প্রথম আহুতি দিয়া যজ্ঞ আরম্ভ করেন। এইভাবে বিজ্ঞানীর দৃষ্টি লইয়া সাফাই করিতে থাকিলে সকল মানুষের মূল্য যে এক, এই সত্য উপলব্ধি করিবার পথে অগ্রসর হইতে পারিব।

[যারবেদা মন্দির হইতে, ১৯৫৭ সংস্করণ]

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

অন্ন-যজ্ঞের ধর্ম

অন্ন-শ্রমের তত্ত্ব আলোচনাকালে বণ্ডারেফের কথা উল্লেখ করিয়া টলস্টয় বলেন যে, এই সত্য মানুষের ইতিহাসের বর্তমান অধ্যায়ে এক যুগান্তকারী আবিষ্কার। এই সত্যের নিহিতার্থ এইরূপ—প্রত্যেক সুস্থ সক্ষম ব্যক্তিকে নিজের অন্ন সংগ্রহের চেষ্টায় উপযুক্ত পরিশ্রম করিতে হইবে। বৌদ্ধিক শক্তির চর্চার দ্বারা জীবিকা সংগ্রহের চেষ্টা করা বা ঐশ্বর্য অর্জন করা উচিত হইবে না, বুদ্ধিবৃত্তিকে একমাত্র মনুষ্যসমাজের সেবার কাজেই নিয়োগ করিতে হইবে। এই নীতি সর্বক্ষেত্রে প্রয়োগ করিতে পারিলেই সকল মানুষের মূল্য সমান হইবে —কাহাকেও অনাহারে থাকিতে হইবে না, ফলে পৃথিবীর পাপের ভার বহুল পরিমাণে লাঘব হইবে।

এরূপ হইতে পারে যে, এই কল্যাণ-নীতি পৃথিবীর সকল লোকই মানিয়া চলিবে না। কিন্তু কোটি কোটি লোক, ইচ্ছা না থাকিলেও না বুঝিয়া এই নিয়ম প্রতিপালন করিয়া চলিতেছে। তাহাদের মন চলিয়াছে প্রতিকূল দিকে, ফলে তাহারা পাইতেছে দুঃখ এবং তাহাদের পরিশ্রমে যে সুফল ফলিতে পারিত তাহা ঘটিতেছে না। এই যে অবস্থা চলিয়াছে, ইহাতে হতাশ হইবার কিছু নাই। বরঞ্চ যাঁহারা এই সত্য উপলব্ধি করিবেন, এই অজ্ঞান ও দুঃখই তাঁহাদের কর্মবিচারের

প্রেরণা যোগাইবে। শ্রদ্ধা সহকারে এই ঈশ্বরদত্ত নীতির নির্দেশ অনুসরণ করিলে তাঁহারা স্বাস্থ্য ও শান্তিলাভ করিয়া সেবাকার্যে অধিকতর যোগ্যতা অর্জন করিতে থাকিবেন।

[আশ্রমবিধির প্রয়োগ, ইংরেজী ১৯৫৫ সংস্করণ]

ইষ্টান ভোগান্ হি বো দেবা দাস্যন্তে যজ্ঞভাবিতাঃ।
তৈর্দত্তান প্রদায়ৈভ্যো যো ভুঙ্‌ক্তে স্তেন এব সঃ॥ ১২

যজ্ঞশিষ্টাশিনঃ সন্তো মুচ্যন্তে সর্বকিল্বিষৈঃ।
ভুঞ্জতে তে ত্বঘং পাপা যে পচন্ত্যাত্মকারণাৎ॥ ১৩

গীতার তৃতীয় অধ্যায়ের উপরোক্ত দ্বাদশ ও ত্রয়োদশ শ্লোকে যে যজ্ঞ শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে, (আমার মতে) তাহার কেবল একটি অর্থই হওয়া সম্ভব। চতুর্দশ শ্লোকে সেই অর্থই স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে।

অন্নাদ্ ভবন্তি ভূতানি পর্জন্যাদন্নসম্ভবঃ।
যজ্ঞাদ্ ভবতি পর্জন্যো যজ্ঞঃ কর্মসমুদ্ভবঃ॥১৪

আর্নল্ড সাহেবের অনুবাদে ইহার অর্থ পরিষ্কার হইয়াছে—

অন্ন হতে বাঁচে জীব
অন্ন দেয় জলে,
বৃষ্টি হয়ে পড়ে জল
যজ্ঞকর্মফলে,
যজ্ঞের আহুতি হয়
শ্রমে ঘর্ম গলে’।

এই চরণগুলিতে কেবল যে দৈহিকশ্রমের তত্ত্বই প্রতিপন্ন হইয়াছে তাহা নহে, ইহাও প্রমাণ হইতেছে যে, শ্রম যখন কেবল নিজের জন্য নয়, সকলের জন্য সম্পাদিত হয় তখনই তাহাকে 'যজ্ঞ' এই আখ্যা দেওয়া যাইতে পারে। বুদ্ধি-কৌশলে বৃষ্টির ধারা নামে না, দৈহিক শ্রমই বৃষ্টিকে ডাকিয়া আনিতে পারে। যেখানে অরণ্য লোপ করিয়া বৃক্ষ-লতাদি অপসারিত হয় সেখানে বৃষ্টিপাত বন্ধ হয়—ইহা একটি অবিসংবাদিত বৈজ্ঞানিক সত্য। আবার ইহাও সত্য যে, যেখানে বৃক্ষাদি রোপণে অরণ্য সৃষ্টি করা হয় সেখানে বৃষ্টিপাত বাড়িতে থাকে। প্রকৃতির নিয়ম এখনও সব জানা হয় নাই, কেবল ভাসা ভাসা দুই-চারিটি তথ্য জানা গিয়াছে মাত্র। দৈহিক শ্রম ত্যাগ করার ফলে কত যে নৈতিক ও দৈহিক ক্ষতি হইতেছে তাহা কে বলিবে?

[ইয়ং ইণ্ডিয়া, ১৩-১০-'২৫]

প্রজা সৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গে, এই যজ্ঞের দায়িত্ব তাহাদের উপর অর্পণ করিয়া ব্রহ্মা বলিয়াছিলেন—"এই যজ্ঞের কল্যাণে তোমাদের শ্রীবৃদ্ধি ঘটুক, এই যজ্ঞ তোমাদের সকল কামনা পূর্ণ করুক।" গীতা বলেন, "যিনি এই যজ্ঞের ধর্ম পালন না করিয়া আহার করিবেন তাঁহার চুরি করিয়া খাওয়া হইবে।" এই যজ্ঞের আহুতি বহু প্রকার হইতে পারে, তাহার মধ্যে অন্নের জন্য শ্রম এক প্রকার যজ্ঞ কার্য। যদি সকলেই নিজের অন্নের জন্য শ্রম করিয়া তাহার অধিক শ্রম নাও করিত তাহা হইলেও

খাদ্য জন্মিত যথেষ্ট এবং সকলে অবকাশও পাইত প্রচুর। এরূপ অবস্থা ঘটিলে আর জনসংখ্যা বৃদ্ধির সমস্যা আতঙ্ক সৃষ্টি করিবে না, রোগ থাকিবে না, বর্তমানে যে দৈন্য আমরা চারিদিকে দেখিতে পাই তাহাও লোপ পাইবে। এই শ্রমই হইবে সর্বশ্রেষ্ঠ যজ্ঞ। এইরূপ অবস্থায় মানুষ দেহ ও মনের শক্তিতে আরও অনেক কার্যসাধন করিবে—সে সকল কাজ হইবে সর্বজনকল্যাণের কাজ—প্রেমের কাজ। তখন আর কেহ দরিদ্র, কেহ ধনী থাকিবে না, কেহই নিজেকে উচ্চ বা নীচ বলিবে না, স্পৃশ্য বা অস্পৃশ্যের ব্যবধান লোপ পাইবে।

মনে হইতে পারে যে, এই আদর্শ বাস্তবে রূপায়িত হওয়া সম্ভব নয়। যদি তাহা নাও হয়, তথাপি এই প্রচেষ্টা হইতে বিরত হওয়া উচিত হইবে না। এই মহাযজ্ঞ আমাদের মনুষ্য-জীবনের সত্তার ধর্ম। যদি ইহার সকল অঙ্গ প্রতিপালন নাও করিতে পারি—যদি কেবল আমাদের অন্নের প্রয়োজন মিটাইবার মত শরীরের শ্রমটুকুও আমরা প্রত্যেকে সাধন করিতে পারি, তাহা হইলেও আমরা সার্থকতার দিকে বহু পরিমাণে অগ্রসর হইতে পারিব।

ঐটুকু করিতে পারিলে আমাদের অভাব কমিয়া যাইবে, খাদ্য হইবে সহজ ও অনাড়ম্বর। তখন আমরা বাঁচিবার জন্যই খাইব, খাওয়ার জন্য বাঁচিব না। যদি কেহ আমার উক্তির সততা সম্বন্ধে সন্দেহ পোষণ করেন, তিনি নিজের অন্নের জন্য মেহনত করিয়া দেখুন পরিশ্রমের অন্ন কত বেশী মিষ্ট—তাহাতে স্বাস্থ্যের কত উন্নতি হয়। এইরূপ করিলে প্রমাণ

হইবে যে যত প্রকার খাদ্য তিনি পূর্বে গ্রহণ করিতেছিলেন তাহার অনেকগুলিই নিষ্প্রয়োজন।

[হরিজন, ১৫-৬-'৩৫]

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

যজ্ঞের তত্ত্ববিচার

পার্থিব অথবা আধ্যাত্মিক কোন লাভের আশা না রাখিয়া অপরের মঙ্গলের জন্য যে কাজ করা হয়, তাহাই যজ্ঞ। 'কাজ' শব্দটিকে এখানে ব্যাপক অর্থেই ব্যবহার করা হইল; ইহার দ্বারা মনন, বাক্য ও আচরণ তিনটিকেই বুঝানো হইল। 'অপর' বলিতে শুধু মনুষ্যলোক নয়, সর্ব-জীবলোককেই বুঝাইতেছে।

কাজকেই যজ্ঞের আহুতি গণ্য করিলে কাজের বিচারে ইহাই বুঝা যায় যে, সেই কাজই মূলতঃ ও প্রধানতঃ যজ্ঞের আহুতি বলিয়া গণ্য হইতে পারে যাহার দ্বারা সর্ববৃহৎ ক্ষেত্রে সর্বাধিক জীবের কল্যাণ সাধন করা যায়। কাজের প্রয়োগ-ক্ষেত্রের বিচারও মূল্যবান। কাজ এরূপ হওয়া চাই যে, তাহা যেন সবচেয়ে অধিক সংখ্যক স্ত্রী বা পুরুষ সবচেয়ে সহজে সম্পন্ন করিতে পারে। এই যুক্তি মানিয়া লইলে ইহা প্রতীয়-মান হয় যে, উদ্দেশ্য মহৎ বলিয়া মনে হইলেও যে কাজে কোন

একটি প্রাণীরও অমঙ্গল ঘটে বা অমঙ্গল কামনা করা হয় সে কাজকে যজ্ঞ বলিয়া গণ্য করা যায় না, মহাযজ্ঞ তো বলাই যায় না। গীতার শিক্ষা হইল এই যে, যে কাজকে যজ্ঞ বলা যায় না তাহা সম্পাদন করিলে মানুষের মুক্তি না হইয়া বন্ধন বাড়িয়াই যায়। আমাদের অভিজ্ঞতাও আমাদের একই কথা বলে।

মুহূর্তমাত্রও যজ্ঞ সম্পাদিত না হইলে সৃষ্টি লোপ পাইবে ; সেই কারণেই গীতা দ্বিতীয় অধ্যায়ে সত্যজ্ঞানের বিচার করিয়া তৃতীয় অধ্যায়ে প্রজ্ঞালাভের পন্থা নির্ণয় করিতে গিয়া স্পষ্টই বলেন যে, সৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গে যজ্ঞের উৎপত্তি ঘটিয়াছে। এই যে দেহ আমরা পাইয়াছি, ইহার একমাত্র সার্থকতা এই সৃষ্টির কল্যাণ সাধনে। এই কারণেই গীতা বলেন যে, যজ্ঞে আহুতি না দিয়া ভোজন করিলে চুরি করিয়া খাওয়া হয়। যিনি শুদ্ধ জীবন যাপন করিতে চাহেন তাঁহার সকল কর্মই যজ্ঞ-কর্ম হওয়া উচিত।

যজ্ঞ-কর্ম করিবার দায়িত্ব লইয়াই মানুষ জন্মগ্রহণ করে। তাই যতদিন জীবন থাকে ততদিনই এই দায়িত্ব পালন করিতে হয়। সেই কারণে চিরদিনই মানুষকে এই সৃষ্টির সেবা করিয়া এই ধর্ম পালন করিতে হয়। যেমন একজন ক্রীতদাস তাহার প্রভুর সেবা করিয়া তাঁহার নিকট নিজের অন্ন-বস্ত্র ইত্যাদি পাইয়া থাকে, তেমনই এই বিশ্বের প্রভুর দেওয়া যাহা পাইব তাহা কৃতজ্ঞ চিত্তে গ্রহণ করিয়া আমরা যেন চরিতার্থ হই। যাহা পাই তাহা প্রভুর অনুগ্রহ বলিয়া যেন মনে করিতে পারি,

কারণ আমরা যেটুকু করি তাহা আমাদের কর্তব্য পালনের জন্যই করি, সেজন্য কোন পুরস্কার পাওয়ার কথা নাই। ঋণ পরিশোধ করিলে ধর্মপালন করা হয় মাত্র, সেজন্য কিছু পাওনা হয় না। তবুও যে আমরা অনেক কিছুই পাই, তাহা প্রভুর অনুগ্রহ; যদি নাও পাই তার জন্য প্রভুকে দোষ দেওয়া যায় না। আমাদের এ জীবন প্রভুরই সম্পত্তি, তাঁর ইচ্ছা হইলে আমরা তাঁর অনুগ্রহ লাভ করিব আর তিনি যদি দয়া না করেন তাহা হইলে এ জীবন ধ্বংস হইয়া যাইবে।

বিশ্বনিয়ন্তার সৃষ্টিবিধান উপলব্ধি করিতে পারিলে বুঝা যাইবে যে, এর জন্য কোন অভিযোগ এমন কি দুঃখ করিবারও কিছু নাই, বরঞ্চ বিধাতা আমাকে দিয়া কি করাইতে চাহেন তাহা বুঝিলে তাঁহার বিধানকে আমরা পরমসুখকর, পরমাগতি বলিয়া মানিয়া লইতে পারিব। তবে এই পরমানন্দ লাভ করিতে হইলে আমাদের গভীর ভক্তি ও বিশ্বাস থাকা চাই।

“নিজের জন্য বিন্দুমাত্রও ব্যস্ত হইও না, সকল দুর্ভাবনা ভগবানের নিকট সমর্পণ কর”—ইহাই সকল ধর্মের নির্দেশ।

ইহাতে ভয় পাইবার কিছু নাই। যিনি সরলভাবে নিজেকে সেবাকার্যে নিয়োগ করিতে পারিবেন তিনিই এই আত্মনিবেদনের প্রয়োজনীয়তা দিনের পর দিন উপলব্ধি করিতে পারিবেন, সেই সঙ্গে তাঁহার শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস দিনের পর দিন বাড়িয়াই চলিবে। যিনি মানুষের জন্মগত এই যজ্ঞের ঋণ স্বীকার করিয়া ক্ষুদ্র স্বার্থ বিসর্জন দিতে প্রস্তুত হইতে না পারেন তাঁর পক্ষে এই সেবার পথে অগ্রসর হওয়া সম্ভব নয়।

জানিয়া বা না জানিয়া আমরা প্রত্যেকেই এই বিশ্বের কল্যাণের জন্য সেবা করিয়া থাকি। যদি ইচ্ছাপূর্বক এই সেবাধর্মকে স্বীকার করিয়া আমরা আমাদের করণীয়টুকু করি তাহা হইলে আমাদের সেবা প্রবৃত্তি ধীরে ধীরে বাড়িয়া যাইবে এবং ফলে শুধু আমাদের নিজেদেরই নয় সমগ্র বিশ্বের সুখবিধানে সক্ষম হইব।

[যারবেদা মন্দির হইতে, ১৯৫৭ সংস্করণ]

পঞ্চম পরিচ্ছেদ
যজ্ঞের অনুষ্ঠান

জীবনের প্রতিটি দিনের প্রতিটি মুহূর্তে আমরা যে কাজ করি বা যে কর্তব্য প্রতিপালন করি বা সংসারের যে সেবা করি সেইগুলির প্রত্যেকটিই যজ্ঞের অঙ্গ। মনে কোন কামনা না রাখিয়া আমরা যে সেবা করি তাহাতে অন্যের উপকার করি এমন নয়, বরঞ্চ নিজেরই কল্যাণ সাধন করি; যেমন যখন আমরা কোন ঋণ শোধ করি তখন আমরা ঋণদাতার উপকার করি না, নিজের ধর্ম পালন করিয়া নিজের ভার লাঘব করি মাত্র। যাহারা সজ্জন কেবল তাহারাই নয়, আপামর সাধারণ সকলেই, যাহার যতটুকু সাধ্য সবটুকুই নরনারায়ণের সেবায় নিয়োগ করিবে ইহাই বিধেয়। ইহাই যদি ধর্ম হয় (এ বিষয়ে সন্দেহ করিবার অবকাশ কোথায়?), সুখভোগের চেষ্টার

কোন স্থান জীবনে থাকে না, সর্বক্ষেত্রে ত্যাগই আচরণীয় ধর্ম হইয়া ওঠে। এই ত্যাগ-ধর্মই মানুষকে ইতর প্রাণীর ঊর্ধ্বে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে।

কিন্তু এই যে ত্যাগ-ধর্ম, ইহার অর্থ এমন নয় যে সংসার ত্যাগ করিয়া বনে বাস করিয়া ধর্ম সাধন করিতে হইবে। সংসারের যাবতীয় কাজে ত্যাগ-বুদ্ধিই ক্রিয়াশীল থাকিবে। যে গৃহস্থ জীবনে ত্যাগ-ধর্মের প্রতিষ্ঠা করিতে প্রয়াস করেন তাঁহাকে সংসারবিরাগী বলিয়া মনে করা ভুল। যে ব্যবসায়ী এই যজ্ঞ সাধন করিতে প্রয়াস করেন, কারবারে কোটি কোটি টাকা খাটাইলেও তিনি সেবার ভাবেই ব্যবসায় পরিচালনা করিবেন। এই যজ্ঞ সাধনের চেষ্টায় তিনি কাহাকেও প্রবঞ্চনা করিবেন না, ফাটকাবাজীরও প্রয়োজন তাঁহার হইবে না ; ফলে তাঁহার জীবনযাত্রা হইবে অনাড়ম্বর ও অহিংস। তিনি লক্ষ লক্ষ টাকার ক্ষতি স্বীকার করিয়াও অপরের অকল্যাণ নিবারণ করিতে সর্বদা প্রস্তুত থাকিবেন। কেহ যেন এরূপ না মনে করেন যে, এরূপ ব্যবসায়ীর অস্তিত্ব কেবল আমার কল্পনাতেই আছে। সৌভাগ্যের বিষয়, এরূপ ধর্মনিষ্ঠ ব্যবসায়ী পাশ্চাত্য জগতে ও প্রাচ্যে এখনও বিরল নয়। ইহা সত্য যে, তাঁহাদের সংখ্যা খুবই সামান্য কিন্তু ধারণার অনুরূপ একজনেরও অস্তিত্ব থাকিলে এই শ্রেণীর ব্যবসায়ীকে কাল্পনিক বলিয়া উড়াইয়া দেওয়া যায় না। আরও গভীরভাবে দেখিলে, সমাজের সকল পর্যায়েই দেখা যাইবে বহু ব্যক্তি নিজের জীবন ধর্মার্থে উৎসর্গ করিয়া সংসার-ধর্ম পালন করিতেছে। এই সকল

ধর্মপরায়ণ লোকেরাও নিজ নিজ জীবিকা উপার্জনের জন্য পরিশ্রম করেন, কিন্তু উপার্জনই তাঁহাদের লক্ষ্য নয়, ধর্মসাধনের প্রয়োজন বোধেই তাঁরা উপার্জন করেন।

এই যে ত্যাগের জীবন, এ জীবনের লক্ষ্য পরম সুন্দরের সাধনা, তাই এ জীবন পরম আনন্দে অভিষিক্ত। যদি ধর্ম পালন করা কষ্টকর বা বিরক্তিজনক মনে হয় তাহা হইলে তাহাকে আর যজ্ঞ বলা যায় না। নিজের ভোগস্পৃহার পরিতৃপ্তির চেষ্টা মানুষকে কেবল মৃত্যুর দিকে লইয়া যায়, ত্যাগের পথেই অমৃতের সন্ধান মেলে। আনন্দের কোন স্বতন্ত্র অস্তিত্ব নাই—আমরা কেমন করিয়া বাঁচি তাহার উপরই আমাদের আনন্দের রূপ ও পরিমাণ নির্ভর করে। কেহ বা রঙ্গমঞ্চের দৃশ্যপট দেখিয়া পরিতৃপ্ত হয়, কেহ বা আকাশপটে প্রকৃতির পরিবর্তনশীল রূপের মহিমাতে মুগ্ধ হয়। তাই বলা যায় যে, কিছুটা ব্যক্তিগত, কিছুটা সামাজিক শিক্ষা ও রুচি-বিকাশের ফলে আনন্দ উপভোগের রকমফের ঘটে। শৈশবে আমরা যে বস্তু বা ঘটনা হইতে আনন্দ লাভ করিতে অভ্যস্ত হইয়াছি, চিরজীবনই তাহা আমাদের আনন্দ দেয়। বিভিন্ন সমাজের আনন্দ বিধানের প্রকরণের বিভিন্নতা হইতে এই সত্যই প্রমাণিত হয়।

অনেক ত্যাগী জনসেবকের এরূপ ধারণা হওয়া সম্ভব যে, যেহেতু তাঁহারা নিঃস্বার্থভাবে সেবা করেন সেই কারণে তাঁহাদের সকল প্রয়োজন, এমনকি তাঁহাদের সখ মিটাইবার জন্য যাহা কিছু আবশ্যক, তাহা জনসাধারণ যোগাইতে বাধ্য। যে মুহূর্তে

কাহারও মনে এই ধারণা জন্মে, তিনি আর জনসেবক থাকেন না, তিনি জনগণের অত্যাচারকারীতে পরিণত হন।

যিনি সেবাকার্যে নিজেকে উৎসর্গ করিবেন তিনি নিজের সুখ স্বাচ্ছন্দ্য বিধানের সকল চিন্তাই ত্যাগ করিয়া নিজের মঙ্গলামঙ্গলের ভার শ্রীভগবানের চরণে সমর্পণ করিবেন। তাঁর ইচ্ছা হয় তিনি সেবককে সুখে রাখিবেন, ইচ্ছা হয় দুঃখ দিবেন। সেই কারণে ভোগ্য যাহা কিছু তাঁর ভাগ্যে মিলিবে, সব কিছু লইয়া ভারাক্রান্ত হওয়া তাঁর ধর্ম নয়, কেবল যেটুকু তাঁর যথার্থ প্রয়োজন সেইটুকু মাত্র লইয়া বাকীটুকু তিনি পরিত্যাগ করিবেন। যদি কোন সময়ে তাঁর অসুবিধাও ঘটে, তিনি নিরুদ্বিগ্ন, বিরক্তিবিহীন ও অবিচলিত থাকিবেন। সেবার গভীর তৃপ্তি তাঁহার অন্তরে পরম শান্তি আনিয়া দিবে, তাহাই হইবে কাজের পুরস্কার—সেবক তাহাতেই সন্তুষ্ট থাকিবেন।

সেবাকার্যে অবহেলা করা বা সম্পাদনে বিলম্ব করা ধর্ম-বিরুদ্ধ। যিনি মনে করেন যে কেবল রোজগারের কাজেই তৎপর হওয়া উচিত, বিনা বেতনের সেবাকার্য যেভাবে হোক সুবিধামত করিলেই চলিবে, তিনি ত্যাগ-ধর্মের গোড়ার তত্ত্বই আয়ত্ত করিতে পারেন নাই। সেবাকার্যে আমাদের সর্বশ্রেষ্ঠ উদ্যোগই প্রয়োগ করা উচিত, কারণ সে কাজের স্থান স্বার্থের প্রয়োজনের অনেক উর্ধ্বে। বস্তুতঃ, সার্থক সেবক নিজেকে পরিপূর্ণভাবে মানুষের সেবায় উৎসর্গ করিয়া দেন; নিজের বলিতে তাঁর কিছুই থাকে না।

[যারবেদা মন্দির হইতে, ১৯৫৭ সংস্করণ]

প্রশ্ন ॥ টলস্টয় যাহাকে 'অন্ন-শ্রম' (Bread Labour) বলিয়াছেন, সে বিষয়ে আপনি কি মত পোষণ করেন? আপনি কি নিজের শরীরশ্রমে নিজের জীবিকা অর্জন করেন?

উত্তর ॥ 'অন্ন-শ্রম' শব্দটি টলস্টয় রচনা করেন নাই। তিনি এই শব্দটি বণ্ডারেফ নামক অপর এক রুশীয় লেখকের লেখা হইতে সংগ্রহ করিয়াছিলেন। অন্ন-শ্রম বলিতে ইহাই বুঝায় যে, প্রত্যেক ব্যক্তিকেই নিজের অন্নের জন্য উপযুক্ত পরিমাণ শ্রম করিতে হইবে। 'জীবিকা অর্জন' শব্দটিকে ব্যাপক অর্থে ব্যবহার করিলে প্রত্যেককেই যে শরীরশ্রমের দ্বারা নিজের অন্ন উৎপাদন করিতে হইবে এরূপ বুঝায় না বরং প্রত্যেক ব্যক্তিই পরিমাণ মত শরীরশ্রম দ্বারা কোন-না-কোন হিতকর কাজ করিবেন ইহাই বুঝায়। আমার নিজের অবস্থা বর্তমানে এরূপ যে, আমি কেবল সুতা কাটাতেই কিছু শ্রম দান করিয়া থাকি। আমি পর্যাপ্ত শ্রম দিতে পারিতেছি না; সুতা কাটার কাজটুকু শ্রমমুখিনতার নিদর্শন মাত্র। এই কারণেই আমি মনে করি যে, আমি সমাজের দানেই বাঁচিয়া আছি। আমি ইহাও বিশ্বাস করি যে, সকল সমাজেই এমন লোক থাকা প্রয়োজন যাঁরা সমাজের সেবায় দেহ মন আত্মা উৎসর্গ করিয়া, নিজের ভরণপোষণের জন্য নির্ভর করিবেন নর-নারায়ণ বা ঈশ্বরের উপর।

[ইয়ং ইণ্ডিয়া, ৫-১১-'৫২]

•

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ
বৌদ্ধিক শ্রম

'বৌদ্ধিক শ্রম' দিয়া কেহ কি জীবিকা উপার্জন করিতে পারিবে না ?

না। দেহের প্রয়োজন দৈহিক শ্রম দিয়াই সাধন করিতে হইবে। "যাহা সীজারের তাহাই সীজারকে দেওয়া উচিত।" বাইবেলের এই উক্তি এই ক্ষেত্রে বিশেষ ভাবে প্রযোজ্য।

যে কাজ কেবল মনেরই তথা বৌদ্ধিক তাহা অন্তরের ব্যাপার সুতরাং তাহার চরিতার্থতাও অন্তরের ব্যাপার। মনের কাজের জন্য কোন মজুরি চাওয়া যায় না। আদর্শ সমাজ-ব্যবস্থায় ডাক্তার, উকিল প্রভৃতি বৌদ্ধিক কর্মীরা কেবল সমাজের সেবার জন্যই কাজ করিবেন, নিজের লাভের জন্য নয়। অন্ন-শ্রমের নীতি মানিয়া চলিলে সমাজের নিয়মে এক নিঃশব্দ বিপ্লব ঘটিবে। যখন জীবন-সংগ্রাম পরস্পরের সেবার সংগ্রামে পরিণত হইবে তখনই মনুষ্যত্বের জয় হইল বলা যাইবে। জীবের ধর্মকে হটাইয়া তখন মানুষের ধর্ম কর্তৃত্বভার গ্রহণ করিবে।

[হরিজন, ২৯-৬-'৩৫]

বৌদ্ধিক কর্মকে আমি হেয় জ্ঞান করিতেছি ইহা মনে করিলে আমাকে ভুল বুঝা হইবে। বৌদ্ধিক কাজের মূল্য

সম্বন্ধে আমি সম্পূর্ণ সচেতন কিন্তু সংসারের কল্যাণে শরীর-শ্রম নিয়োগ করার যে কর্তব্য লইয়া আমরা দেহ ধারণ করিয়াছি—মূল্যবান বৌদ্ধিক শ্রমের প্রভূত পরিমাণের দ্বারাও সে কর্তব্য পালন করা হয় না। ইহা সম্ভব যে বৌদ্ধিক শ্রম শরীরশ্রম অপেক্ষা বহুগুণে উন্নত—প্রকৃত প্রস্তাবে, তাহা বহুক্ষেত্রেই প্রমাণিত হইয়াছে। কিন্তু শরীরশ্রমের কাজ বৌদ্ধিক শ্রম দ্বারা সাধন করা সম্ভব নয়; যেমন মনের খোরাক দেহের খাদ্যের চেয়ে শ্রেষ্ঠতর হইলেও, মনের খোরাক দিয়া দেহকে বাঁচাইয়া রাখা যায় না। বস্তুতঃ মাটির ফসল না ফলাইলে বুদ্ধির ফসল ফলানো অসম্ভব।

[ইয়ং ইণ্ডিয়া, ১৩-১০-'২৫]

"শ্রম ও কৃষ্টিকে কি স্বতন্ত্রভাবে বিচার করা যায় না?"

"ইহা সম্ভব নয়। প্রাচীন রোমে অভিজাত শ্রেণী শ্রম বর্জন করিয়া কৃষ্টির চর্চা করিবার চেষ্টা করিয়া সর্বনাশ ডাকিয়া আনিয়াছিলেন। শ্রমবিমুখ সভ্যতা বা শ্রমলব্ধ নয় এমন সভ্যতাকে একজন রোমান ক্যাথলিক লেখক বলিয়াছেন 'Vomitoria' বা 'বমনোদ্রেককর সভ্যতা'। রোমকগণ শ্রমবিমুখ ভোগচর্চাকে অভ্যাসে পরিণত করিয়াছিলেন সেই কারণে রোমক জাতি বিনষ্ট হইয়া গেল। সর্বসময় পড়া লেখা বা বক্তৃতা দেওয়ার কাজ করিয়া মানুষের মনের সম্যক্ বিকাশ হওয়া সম্ভব নয়। আমার নিজের কথা বলিতে পারি, আমি যাহা কিছু পড়িয়াছি তা জেলের ভিতরে থাকা কালীন

অবকাশের স্থবিধায় পড়িয়াছি। ইহাতে আমি লাভবান হইয়াছি, কারণ সেই পড়া হেলাফেলা করিয়া সখের পড়া হয় নাই, বিশেষ উদ্দেশ্য লইয়া শিক্ষার জন্যই আমি পড়িয়াছি। আমার জীবনে এমন অনেক দিন গিয়াছে যখন আমি অনেক দিন, অনেক মাস ধরিয়া প্রতিদিন একাদিক্রমে আট ঘণ্টা শারীরিক শ্রমে নিযুক্ত থাকিয়াছি, তাহাতে আমার কোন মানসিক অবনতি হইয়াছে বলিয়া আমি মনে করি না। এমন অনেকদিন গিয়াছে যখন আমি দিনে চল্লিশ মাইল করিয়াও হাঁটিয়াছি, তাহার জন্য আমার বুদ্ধি বা উৎসাহ কমিয়াছে বলিয়া মনে হয় না।"

"আপনার যে মনস্বিতা আছে তাহার বলেই এরূপ সম্ভব হইয়াছে।"

"এরূপ মনে করার কোন কারণ নাই। বাল্যকালে দেশের স্কুলে ও ইংলণ্ডে আমি সাধারণ ছেলেদের দলেই ছিলাম। ছাত্রদের তর্কসভায় এমনকি নিরামিষভোজীদের সভায়ও কিছু বলার মত সাহস আমার হইত না। এরূপ মনে করার কোনই কারণ নাই যে, ভগবান আমাকে কোন অসাধারণ ক্ষমতার অধিকারী করিয়া পাঠাইয়াছেন। আমার বিশ্বাস তৎকালে কথা বলার শক্তি না দিয়া ভগবান আমার কল্যাণই করিয়াছেন। এ কথাও জানিয়া রাখা উচিত যে, আমার খুব কম পড়াশুনাই আছে।"

[হরিজন, ১-৮-৩৬]

জনৈক অভ্যাগত গান্ধীজীকে বলিয়াছিলেন যে, গান্ধীজী শরীরশ্রমের মাহাত্ম্যের উপর অসাধারণ জোর দিতেছেন; এমনও মনে করা যায় যে শ্রমকে তিনি অলৌকিক শক্তিসম্পন্ন বলিয়া প্রতিপন্ন করিতে চাহিতেছেন।

উত্তরে গান্ধীজী বলিয়াছিলেন—"মোটেই তাহা নয়। আমি যাহা বলিয়াছি তাহা স্পষ্ট করিয়াই বলিয়াছি। তবে আমার মনে হয় শ্রমের গুণ আমি যথেষ্ট জোর দিয়া বলিতে পারি নাই। আমি কেবল গীতার শিক্ষার পুনরাবৃত্তি করিয়াছি মাত্র। গীতায় শ্রীভগবান বলিয়াছেন—'যদি আমি বিনিদ্র হইয়া অহরহ কর্মে রত না থাকি তাহা হইলে লোকসমাজে কুদৃষ্টান্ত স্থাপন করা হইবে।' এইজন্যই আমি দেশের জ্ঞানী, গুণী লোকদের চরকা চালাইতে অনুরোধ করি—তাঁদের দেখিয়া জনসাধারণ কাজ করিতে শিখিবে।"

"বুদ্ধদেবের ন্যায় মহাপুরুষদেরও কি আপনি চরকা চালাইতে বলিবেন?"

"নিশ্চয় বলিব। ইহাতে আমার কোন দ্বিধা নাই।"

"তাহা হইলে আপনি তুকারাম, ধ্যানদেব ইত্যাদি সাধু-সন্তদের সম্বন্ধে কি মত পোষণ করেন? (তাঁরা তো শরীর-শ্রমের কথা বলেন না?)"

"তাঁদের বিচার করার ক্ষমতা আমাদের মত লোকের থাকে না।"

"কিন্তু আপনি বুদ্ধদেবের বেলায় তো বিচার করিতেছেন।"

"বিচার আমি করি নাই। আমি কেবল এইটুকুই বলিয়াছি

যে, যদি আমার এমন ভাগ্য হয় যে এমন মহাপূরুষের সাক্ষাৎ পাই তাহা হইলে আমি নিঃসঙ্কোচে জিজ্ঞাসা করি যে, তিনি ধ্যান-ধারণার কথা না বলিয়া জনসাধারণকে কাজ করিতে বলেন না কেন ? যদি আমি তুকারাম ইত্যাদি সন্তদের সাক্ষাৎ পাই তাহা হইলেও আমি একই প্রশ্ন করি।"

[হরিজন, ২-১১-'৩৫]

সপ্তম পরিচ্ছেদ
অবসরের সমস্যা

জনৈক বন্ধু গান্ধীজীকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"কাজের বিষয় বলার সময়, কাজের পর অবসরের বিষয়ে তো আপনি কিছু বলেন না। গরীব লোকদের অনেক বেশী কাজ করিতে হয়, তাই তারা চিন্তার বা চিত্তবিনোদনের জন্য খুবই কম সময় পায়—তার উপর আপনি তাদের আরও কাজ করিতে বলিতেছেন।"

"সত্যই কি তাই ? আমি তো তাদের কথাই ভাবিতেছি যারা তাদের প্রচুর অবসরের বোঝা লইয়া কি করিবে ভাবিয়া পায় না। বাধ্য হইয়া আলস্যের কবলে পড়িয়া তাহারা ক্রমে অসাড় পাথরের মত জড় পদার্থ হইয়া গিয়াছে। জড়তা

তাদের এতই পাইয়া বসিয়াছে যে, কাজ করিতে বলিলে তাদের অনেকে বিরক্ত হয়।"

"যেখানে কাজের অভাব সেখানে কাজ তো দিতেই হইবে। কিন্তু নিজের গম যাঁতায় ভাঙ্গিতে, নিজের ধান ঢেঁকিতে কুটিতে বলিয়া আপনি কি তাদের ঘাড়ে একঘেয়ে ভারী কাজের বোঝা বেশী করিয়া চাপাইয়া দিতেছেন না?"

"তারা বাধ্য হইয়া যে নিরবচ্ছিন্ন কুঁড়েমির বোঝা বহন করে, এ বোঝা তার চেয়ে বেশী একঘেয়ে বা বেশী ভারী নয়। তার উপর যখন তারা বুঝিতে পারিবে যে এই প্রচেষ্টায় তারা নিজের ও দেশের লোকের স্বাস্থ্যের উন্নতি সাধন করিতেছে, নিজেরাও সেইসঙ্গে কয়েকটা পয়সা বাঁচাইতে পারিতেছে, তখন আর এ কাজ একঘেয়ে বলিয়া মনে হইবে না। এও সত্য যে, আধুনিক কারখানার কাজে খাটিয়া মরার চেয়ে এ কাজ কিছুমাত্র বেশী একঘেয়ে নয়। অতি সামান্য কাজও একঘেয়ে হয় না যদি তাতে স্বাধীন সৃষ্টির আনন্দ থাকে। একটি বড় জুতা তৈয়ারীর কারখানায় গেলে দেখা যায়, একদল লোক জুতার তলার চামড়া তৈয়ারী করিতেছে, অপর একদল জুতার উপরের সাজ সেলাই করিতেছে, তৃতীয় একদল তৃতীয় রকমের কাজ করিতেছে। সেখানে সম্পূর্ণ জুতাটি গড়ার ভার কাহারও উপর থাকে না বলিয়া বুদ্ধির প্রয়োগের ক্ষেত্রও সীমিত, ফলে কাজ হইয়া ওঠে একঘেয়ে। যে কারিগর নিজেই সম্পূর্ণ জুতাটি তৈয়ারী করিবার সুযোগ পায় তার কাজে থাকে সৃষ্টির আনন্দ, সে কাজ কখনও একঘেয়ে হয় না।

তাই তার সকল কাজে থাকে তার কারিগরীর ছাপ আর সে পায় কিছু গড়িবার পুরা আনন্দ। কাজের আনন্দ নির্ভর করে কারিগরের মনের ভাবের উপর, তাই আমি নিজের জন্য জল তুলিতে বা কাঠ কাটিতে কোনই অসুবিধা বোধ করি না যদি আমি তা স্বাধীনভাবে, নিজের বুদ্ধিকৌশলে করিতে পাই, কেহ যদি আমাকে সে কাজ করিতে বাধ্য না করে। কল্যাণ-বুদ্ধি প্রণোদিত হইয়া যে কোন কাজই করা যায় তাহাতে থাকে সৃষ্টির আনন্দ আর অবকাশ বিনোদন।"

"সে কথা মানিয়াও ভাবিয়া দেখিতে হয় যে, যখন আপনি চাহেন যে সকলে সারাদিন ধরিয়া একান্ত দৈহিক শ্রমেই লাগিয়া থাকুক, তখন কি এই শ্রমকারীদের বুদ্ধি ভোঁতা করিয়া দিবার আশঙ্কা থাকে না? কত ঘণ্টা দৈহিক পরিশ্রম করা আপনি প্রয়োজনীয় বলিয়া মনে করেন?"

"আট ঘণ্টা শ্রম করাতে আমি কোন আপত্তির কারণ দেখি না।"

"আপনাকে দিয়া এ বিচার সম্ভব নয়। আপনার যে প্রতিভা ও সৃজনী শক্তি আছে, বাকী সময়টুকুতে আপনি অনেক কিছু করিতে পারিবেন। আপনার সঙ্গে আর পাঁচ জনের তুলনা হইতে পারে না। আট ঘণ্টা ধরিয়া চরকা কাটিলেও আপনি তাহা হইতে আনন্দ সংগ্রহ করিতে পারিবেন।"

"সে কথা ঠিক নয়। আমি চাই যে সকলেই এই আট ঘণ্টা শ্রমের মধ্যে আনন্দ সংগ্রহ করুক। কোন্ প্রেরণার

বশে লোকে পরিশ্রম করে, তারই উপর এই আনন্দ নির্ভর করে। যদি সদুদ্দেশ্যে ও পবিত্র মনে দিনে আট ঘণ্টা শরীরশ্রম করা যায়, তার পরেও বুদ্ধিবৃত্তি চরিতার্থ করার বহু সময় পাওয়া যাইবে। আমার উদ্দেশ্য এই জড়তা, এই গতিহীনতার অবসান হোক, আমি যেন সানন্দে ঘোষণা করিতে পারি যে, ভারতের গ্রামগুলির প্রতিটি অধিবাসী মাথার ঘাম পায়ে ফেলিয়া নিজের মেহনতে মাসে কুড়ি টাকা (১৯৩৫ সাল) করিয়া রোজগার করিতেছে।”

[হরিজন, ৮-২-'৩৫]

কিছুকাল পূর্বে এই পত্রিকাতে শ্রী এল. পি. জ্যাক লিখিত অবকাশের সংজ্ঞা ছাপা হইয়াছিল। তিনি বলেন, “মানুষের জীবনে সেই সময়টুকুই অবকাশ যখন সুমতি ও কুমতির মধ্যে ঘোরতর লড়াই চলে তার মনকে দখল করার জন্য।” তাঁর মতে অবসরের তত্ত্ব বোঝা যেমন দুরূহ, অবসরের সুপ্রয়োগও তেমনি সমস্যাসঙ্কুল। শ্রীবারট্রাণ্ড রাসেল মানুষকে অবসর দিবার আগ্রহে কাজের সময় চার ঘণ্টায় পরিমিত করিবার পক্ষপাতী। জনৈক শ্রদ্ধেয় বন্ধু গান্ধীজীর সহিত আলাপ করিবার সময় অবসরকাল ব্যবহার করার কোন সমস্যা থাকার বিষয়ে সন্দেহ প্রকাশ করিয়া বলেন যে, “আট ঘণ্টা দৈহিক শ্রমের উপর জোর দেওয়ার কি দরকার? সুসংস্থিত সমাজে কাজের সময় কমাইয়া দুই ঘণ্টা করিয়া বৌদ্ধিক ও কলা বিষয়ক চর্চার অধিকতর সুযোগ করিয়া দেওয়াই শ্রেয়ঃ।”

"আমরা দেখিতে পাই যে, যেখানে কর্মী বা শিক্ষিত ব্যক্তি অধিক পরিমাণ অবসর পাইয়া থাকেন, তাঁরা এই সুযোগের সদ্ব্যবহার করেন না। বরঞ্চ অধিকাংশ ক্ষেত্রে কর্মহীন মন শয়তানের কারখানা হইয়া ওঠে।"

"অবসরকাল নষ্ট করাই রীতি নাও হইতে পারে। এমন ব্যবস্থা করা সম্ভব যে, আট ঘণ্টার মধ্যে দুই ঘণ্টা শরীরশ্রম দিবার পর ছয় ঘণ্টা বৌদ্ধিক শ্রম দিতে হইবে। ইহাতে জাতির উন্নতি হওয়াই সম্ভব।"

"আমি জানি না এরূপ ব্যবস্থা সম্ভব কি না। আমি সূক্ষ্ম-ভাবে হিসাব না করিয়া বলিতে পারি যে, যদি জাতির কল্যাণের জন্য কিছু না করিয়া নিজের সুবিধার জন্যই বৌদ্ধিক শ্রমকে খাটানো যায় তাহা হইলে এ ব্যবস্থা চলিতে পারে না। অবশ্য যদি রাষ্ট্র দুই ঘণ্টা কাজের জন্য যথেষ্ট মূল্য দিয়া কর্মীদের আরও ছয় ঘণ্টা বিনা বেতনে বৌদ্ধিক শ্রম করিতে বাধ্য করে, তাহা হইলে এই ব্যবস্থা লাভজনক হইলেও হইতে পারে। কিন্তু এ ব্যবস্থা চালু করিতে রাষ্ট্রকে বাধ্যতামূলক আইন রচনা করিয়া তাহা কঠোরভাবে প্রয়োগ করিতে হইবে।"

"কিন্তু আপনাকে দৃষ্টান্তস্বরূপ ধরিলে কি দেখি? আপনি আট ঘণ্টা শরীরশ্রম করার পর কেমন করিয়া আট ঘণ্টা বৌদ্ধিক শ্রম করিবেন? আপনার তো এমন অবসর নাই যা আপনি নষ্ট করিতে পারেন?"

"আমার কাজ আমাকে করিতেই হইবে—এ কাজের কোন অবকাশ নাই। যদি আমি টেনিস খেলায় সময় ব্যয় করিতে

পারিতাম তাহা হইলে অবকাশ আছে বলিতে পারিতাম। কিন্তু আমার নিজের কথা ধরিয়াও বলিতে পারি যে, আট ঘণ্টা মন দিয়া দৈহিক পরিশ্রম করিতে পারিলে আমাদের মনের বহু উন্নতি সাধিত হয়। ইহার ফলে অলস কল্পনা মন হইতে দূর হইবে, যাহা আমি নিজে সম্যক্‌ভাবে করিতে সক্ষম হই নাই। তবে আমি আজ যে অবস্থায় আসিয়াছি—জীবনের প্রারম্ভে শরীরশ্রমের মূল্য বুঝিতে পারাতেই ইহা সম্ভব হইয়াছে।"

"যদি শরীরশ্রমের নিজস্ব এতই গুণ থাকে তাহা হইলে আমাদের দেশের লক্ষ লক্ষ শ্রমিক যারা দৈনিক আট ঘণ্টারও বেশী শরীরশ্রম করিয়া আসিতেছে তাদের মন অধিকতর শুদ্ধ ও শক্তিশালী হইয়াছে বলিয়া মনে হয় না কেন?"

"কেবল শরীরশ্রমের ফলেই মনের উন্নতি হয় না; অবশ্য বৌদ্ধিক শ্রমের ফলেও হয় না তাহাও দেখা গিয়াছে। এই উভয় শ্রমই আমাদের দেশের লোকের পক্ষে খাটিয়া মরা মাত্র হইয়াছে। এর ফলে আমাদের মনের সুকুমার বৃত্তিগুলি নষ্ট হইতেছে। এই কারণেই বর্ণ হিন্দুদের বিরুদ্ধে আমার প্রবল অভিযোগ আছে। উচ্চ বর্ণের হিন্দুরা এমন ব্যবস্থা করিয়াছেন যাহার ফলে কাজ কর্মীদের পক্ষে কষ্টদায়ক করণীয় মাত্র হইয়া পড়িয়াছে, তাহাতে না আছে কোন আনন্দ, না আছে কোন প্রেরণা। যদি বর্ণহিন্দুরা এই শ্রমিকদিগকে নিজেদের সমান মর্যাদা দিয়া সমাজে সমান আসন দিতেন তাহা হইলে আজ তাঁহারা নিজেদিগকে গৌরবান্বিত মনে করিতে পারিতেন। আজকের যুগকে বলা হয় কলিযুগ। সত্যযুগ কবে ছিল জানি না,

তবে সেই স্বর্ণ যুগে সমাজ যে অনেক সুব্যবস্থিত ছিল তা আমি বিশ্বাস করি। আমাদের প্রাচীন দেশে নূতন নূতন সভ্যতার আবির্ভাব হইয়াছে, বিলয় হইয়াছে—কোন বিশেষ যুগে আমরা কী অবস্থায় ছিলাম তা বলা শক্ত। কিন্তু আজ আমাদের যে অবস্থা তাহা যে বহুদিন ধরিয়া শ্রমিক বা শূদ্রদিগকে অবহেলা করার ফল, এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। আজকের দিনের গ্রামীণ সভ্যতার (যদি ইহাকে সভ্যতা বলা যায়) রূপ বড়ই ভীষণ। গ্রামের মানুষের অবস্থা ইতর প্রাণীদেরও অধম। জন্তুরা প্রাকৃতিক নিয়মের বশে চলিতে ও বাঁচিতে বাধ্য। আমরা আমাদের শ্রমিকদের এমন অবস্থায় আনিয়া ফেলিয়াছি যে, তারা প্রাকৃতিক নিয়মেও চলিতে ও বাঁচিতে পারে না। যদি আমাদের দেশের লোক বুদ্ধি সহকারে আনন্দের সহিত শ্রম করিয়া চলিবার চেষ্টা করিত তাহা হইলে আমাদের অবস্থা হইত বিপরীত।"

(মহাদেব দেশাই লিখিত 'সাপ্তাহিক পত্র')

[হরিজন, ১-৮-'৩৬]

অষ্টম পরিচ্ছেদ

শ্রমের মর্যাদা

আমরা কেন দৈহিক শ্রমসাধন করিব? এ প্রশ্নের উত্তরে কেহ বলিতে পারেন—"দৈহিক শ্রম করিবে তাহারাই, যাহারা লেখাপড়া জানে না। আমার মত শিক্ষিত ব্যক্তির কাজ সাহিত্য বা রাজনৈতিক রচনাবলী পড়াশুনা করা।"

আমার ধারণা শ্রমের মর্যাদা আমরা বুঝিতে পারি নাই। একজন নাপিত বা চর্মকার যদি কলেজে পড়ে তাহা হইলেও তাহার নিজের ব্যবসায় ত্যাগ করা উচিত নয়। আমি বিশ্বাস করি যে, নাপিতের কাজ চিকিৎসকের কাজের সমান মূল্যবান।

[মহাত্মা গান্ধীর রচনা ও বক্তৃতাবলী, ১৯৩৩ সংস্করণ]

আমাদের দেশের অনাবরণ দারিদ্র্য ও কর্মহীনতা দেখিয়া আমার চোখে জল আসে। কিন্তু আমাদেরই অবহেলা ও অজ্ঞতাই বহুল পরিমাণে এই অবস্থার কারণ। কাজের মর্যাদার সম্বন্ধে আমাদের সম্যক্ জ্ঞান নাই। এই কারণে দেখা যায়, একজন চর্মকার জুতা তৈয়ারী ছাড়া অন্য কাজ করিতে চায় না, মনে করে যে তাহাতে তার সম্মান নষ্ট হইবে। এই ভ্রান্ত ধারণার অবসান হওয়া প্রয়োজন। যারা নিজের হাতে কাজ করিতে প্রস্তুত এমন লোকের জন্য ভারতে কাজের অভাব নাই। ভগবান প্রতিটি মানুষকে কাজ করিবার শক্তি

দিয়াছেন, দিনের খাদ্যের অধিক উপার্জনের ক্ষমতা দিয়াছেন। যে ব্যক্তি এই ঈশ্বরদত্ত ক্ষমতার সদ্ব্যবহার করিতে চায় তার কাজের অভাব হয় না। যে ধর্মপথে থাকিয়া জীবিকা অর্জন করিতে চায়, তার কাছে কোন কাজই হীন নয়। আমাদের একমাত্র করণীয় হইল ভগবান আমাদের যে শ্রমশক্তি দিয়াছেন তাহা কাজে লাগাইবার জন্য সর্বদা প্রস্তুত থাকা।

[হরিজন, ১৯-১২-'৩৬]

শ্রমের সহিত বুদ্ধির বিচ্ছেদের ফলে আমাদের গ্রামগুলি অবহেলার পাপে ধ্বংস হইতে চলিয়াছে। এই কারণে আমাদের দেশ সুদৃশ্য গ্রামাঞ্চলে সুশোভিত না হইয়া আজ আবর্জনার স্তূপে কুৎসিৎ হইয়া রহিয়াছে। অনেক গ্রামের কাছে যাইতেই মন ক্লিষ্ট হইয়া ওঠে, চতুর্দিকের আবর্জনা ও দুর্গন্ধের জন্য চোখ নাক বন্ধ করিয়া চলিতে ইচ্ছা করে। যদি কংগ্রেসের অধিকাংশ সভ্যই গ্রাম হইতে আসিয়া থাকেন (যাহা হওয়াই সম্ভব), তাহা হইলে তাঁহাদের কর্তব্য গ্রামগুলিকে পরিচ্ছন্নতার আদর্শে রূপান্তরিত করা। কিন্তু দুঃখের বিষয় তাঁরা কোন দিনই নিজেদের গ্রামবাসীদের সম-সুখদুঃখভাগী মনে করিয়া তাহাদের জীবনযাত্রায় অংশ গ্রহণ করেন নাই। সামাজিক বা জাতীয় স্বাস্থ্যবিধির চর্চাকে আমরা শিক্ষণীয় ধর্ম বলিয়া কোন দিনই মনে করি নাই। স্নান আমরা প্রত্যেকেই কোন না কোন রকমে করিয়া থাকি, কিন্তু স্নানাদি শৌচ সম্পাদনের সময়ে গ্রামের কুয়া বা পুকুর বা

নদীর ধার নোংরা করিতে আমাদের বাধে না। এই কদভ্যাসকে আমি মহাপাপ বলিয়া মনে করি—এই পাপেই আমাদের গ্রামের এই দুরবস্থা, পুণ্যতোয়া নদনদীর পবিত্র তটভূমির এই মলিনতা আর এই অস্বাস্থ্যকর অভ্যাসের ফলে যে সকল রোগ হয় তাহার ক্রমবিস্তৃতি।

[গঠনমূলক কর্মপদ্ধতি, ১৯৪৮ সংস্করণ]

শরণার্থীরা অন্ন, বস্ত্র ও আশ্রয় পাইয়াও কোন কাজ করিতে চাহে না, এই অভিযোগের উত্তরে গান্ধীজী বলেন—

যদি কোন লোক বিপদে পড়ে, তাহার শ্রমশক্তিই তাহার সুখ ফিরাইয়া আনিতে পারে। আহার-বিহারে সন্তুষ্ট থাকিবার জন্য ভগবান আমাদের সৃষ্টি করেন নাই। গীতা আমাদিগকে শিখাইয়াছেন যে, প্রত্যেকেই যজ্ঞ বা অন্নশ্রম সম্পাদন করিয়া শ্রমোৎপন্ন ফলের দ্বারা জীবন রক্ষা করিবে। কোটিপতিরাও শ্রমবিমুখ হইলে পরান্নভোজীতে পরিণত হন। ধনবানেরও কর্তব্য যথাবিধি শ্রমসাধন করিয়া অন্ন গ্রহণ করা; না পারিলে আহার ত্যাগ করা। কেবল অঙ্গহীন বা স্বাস্থ্যহীন ব্যক্তিদের বেলায় এই নিয়ম প্রযোজ্য নয়। সমাজ তাহাদের জন্য দায়িক। শরণার্থীদের অনেক রকম কাজেরই সুযোগ রহিয়াছে; তাঁহাদের পল্লীর স্বাস্থ্যরক্ষার কাজ তাঁহাদের নিজেদেরই করা উচিত। যেমন পায়খানা পরিষ্কার, সাফাই ইত্যাদি। তাঁহারা সূতা কাটা ইত্যাদি নানা শিল্পকাজও

করিতে পারেন। তাঁহারা যে অবস্থায় পড়িয়াছেন তাহারই মধ্যে বুঝিয়া খুঁজিয়া উপযুক্ত কাজ তাঁহাদের করা উচিত।

[দিল্লী ডায়েরী, ১৯৪৮ সংস্করণ]

নবম পরিচ্ছেদ

সমাজসেবার শ্রেষ্ঠরূপ

অন্নশ্রমের তত্ত্ববিচারে কিছু ভ্রান্ত ধারণা রহিয়াছে। সমাজ-সেবার সহিত অন্নশ্রমের কোন বিরোধ নাই। সুবুদ্ধি পরিচালিত অন্নশ্রম সর্বকালের শ্রেষ্ঠ সমাজসেবা। যেহেতু, নিজের শ্রমে দেশের প্রয়োজনীয় সম্পদ্ বাড়ানোর চেয়ে কল্যাণকর কাজ আর কি হইতে পারে? কল্যাণের আদর্শে বাঁচাই তো সেবা করা।

'অন্নশ্রম' শব্দের পূর্বে 'সুবুদ্ধি পরিচালিত' শব্দটি ব্যবহার করিয়া ইহাই বুঝাইতে চাহিয়াছি যে, শ্রমকে সেবায় রূপান্তরিত করিতে হইলে কর্মীর অন্তরে বিশেষ লক্ষ্যের বোধ থাকা প্রয়োজন। তাহা না হইলে সকল কাজকেই তো সমাজসেবা বলা যায়। সকল কাজকেই সমাজসেবা বলিতে বাধা নাই কিন্তু এক্ষেত্রে কাজ ছাড়াও আরও কিছু বুঝানো হইয়াছে। যে শ্রমিক সকলের কাজে খাটে সে সমাজেরই সেবা করে সুতরাং সে তার মজুরী পাইবার যোগ্য। সুতরাং অন্নের জন্য এই যে

শ্রম সম্পাদিত হয়, ইহাকেও সমাজের সেবা বলা যায়। তফাৎ কোথায়? সংসারের সকল শ্রমিকই কাজ করে নিজের জন্য অথবা নিজের পরিবারের জন্য; সমাজসেবক কাজ করেন সকলের কল্যাণের জন্য।

[হরিজন, ১-৬-'৩৫]

শহর হইতে গ্রামে ফিরিয়া যাওয়ার অর্থই হইল স্বেচ্ছায় অন্নশ্রম এবং তাহার আনুষঙ্গিক সকল কর্তব্যের দায়িত্ব গ্রহণ করা। কিন্তু সমালোচকেরা বলেন—ভারতে কোটি কোটি লোক আজও গ্রামে বাস করিতেছে কিন্তু তাহারা অনাহারে, অর্ধাহারে কোনরকমে বাঁচিয়া আছে মাত্র। আমাদের ভাগ্য-দোষে এই বর্ণনা মর্মান্তিক সত্য। কিন্তু ইহাও সত্য যে, তাহারা স্বেচ্ছায় এই অবস্থা স্বীকার করিয়া লয় নাই। সাধ্যে থাকিলে তাহারা সর্বপ্রকার শরীরশ্রমই বর্জন করিত, এমনকি যদি সম্ভব হইত তাহা হইলে কালবিলম্ব না করিয়া তাহারা নিকটতম শহরে যাইয়া আশ্রয় লইত।

অবস্থার বিরুদ্ধে সংগ্রাম না করিয়া এই যে বাধ্য হইয়া দুর্গতি বরণ, ইহা দাসত্বেরই নামান্তর। কিন্তু স্বেচ্ছায় পিতৃ-আজ্ঞা পালনের জন্য দুঃখ স্বীকারের মধ্যে পুত্রের ধর্ম পালনের গৌরব আছে। দুর্গতির বিরুদ্ধে সংগ্রাম নাই, আছে কেবল উদরান্নের জন্য নতমস্তকে মেহনৎ—ফলে আসিয়াছে অভাব, অস্বাস্থ্য এবং অতৃপ্তি। ইহাকেই বলে দাসত্ব। কল্যাণবুদ্ধিপ্রণোদিত হইয়া যদি গ্রামের লোক স্বেচ্ছায় শ্রম-যজ্ঞের ধর্মে নিজেদের

নিয়োগ করিত তাহা হইলে আসিত তৃপ্তি ও স্বাস্থ্য। এই স্বাস্থ্যই প্রকৃত সম্পদ্, সোনা রূপা যথার্থ সম্পদ্ নয়।

[হরিজন, ২-৩-'৩৫]

যদি প্রত্যেক ব্যক্তিই শ্রমার্জিত অন্নে জীবন ধারণের প্রয়াস করিত তাহা হইলে এই পৃথিবী স্বর্গে পরিণত হইত। এরূপ অবস্থায় বিশেষ গুণসম্পন্ন ব্যক্তিদের শক্তির ব্যবহারের জন্য কোন স্বতন্ত্র বিচারের প্রয়োজন ঘটিত না। যদি সকলেই অন্নের জন্য শরীরশ্রম সম্পাদন করিত তাহা হইলে কবি, চিকিৎসক, আইনবিদ্ প্রভৃতি বিশেষ গুণসম্পন্ন ব্যক্তিরা মানিয়া লইতেন যে, তাঁহারা তাঁহাদের শক্তির প্রয়োগ করিবেন লাভের জন্য নয়—বিনা স্বার্থে নর-নারায়ণের সেবার জন্যই। তাঁদের এই স্বার্থবিহীন সেবার জন্য তাঁদের কাজ উত্তরোত্তর অধিকতর মূল্যবান ও কল্যাণদায়ী হইয়া উঠিত।

[হরিজন, ২-৩-'৪৭]

আমাদের প্রয়োজনের পরিমাপে ভগবান সম্পদ্ সৃষ্টি করেন। ফলে যদি কেহ প্রয়োজনের অতিরিক্ত দখল করিতে চায় তাহা হইলে তার নিকটতম লোকদের বঞ্চিত করিয়া তবে সে বেশী পাইতে পারে।

পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে যে খাদ্যাভাব দেখা যায় তাহার কারণই হইল সেখানকার অনেক লোক নিজের প্রয়োজনের অতিরিক্ত দখল করিতেছে। প্রকৃতির সম্পদ্ আমরা যেমন খুশী

ব্যবহার করিতে পারি, কিন্তু প্রকৃতির খাতায় জমা ও খরচের অঙ্কের গরমিল হওয়ার উপায় নাই। সে হিসাবে জমা ও খরচের ঘরে কিছুই অবশিষ্ট থাকে না।

মানুষ যেখানে চাষে যন্ত্রশক্তি প্রয়োগ করিয়া এবং রাসায়নিক সার ব্যবহার করিয়া বেশী ফসল ফলায় অথবা একই উপায়ে অধিকতর শিল্পসম্ভার প্রস্তুত করে, সেখানেও এই নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটে না। কারণ এই যন্ত্র এই সার সবই প্রাকৃতিক শক্তির বিবর্তন মাত্র। যত কৌশলই আমরা অবলম্বন করি না কেন, হিসাবের শেষে জমা খরচ সমান হইয়া অবশেষে হইবে শূন্য।

[আশ্রমবিধির প্রয়োগ, ১৯৫৫ সংস্করণ]

প্রথম হইতেই আমার বিশ্বাস যে, আমাদের দেশে কৃষিই একমাত্র নির্ভরযোগ্য চিরন্তনী ভরসাস্থল। এই কাজকেই ভিত্তি করিয়া চেষ্টা করা উচিত আমরা কতদূর অগ্রসর হইতে পারি। যদি খাদির কাজের পরিবর্তে কোন কোন যুবক কৃষি বিদ্যার চর্চা করিয়া বিশেষজ্ঞ হইতে পারে, তাহাতে আমার আদৌ কিছু বলিবার আছে বলিয়া আমি মনে করি না।

[খাদি—কেন ও কিরূপে, ১৯৫৯ সংস্করণ]

দশম পরিচ্ছেদ

চরকা ও শ্রমযজ্ঞ

বাঁচিয়া থাকার জন্য যেমন নিজের অন্ন, পানীয় ও বস্ত্র সংগ্রহ করিতে হয় সেইরূপ প্রত্যেকেরই নিজের প্রয়োজনীয় বস্ত্রের জন্য সুতা কাটা অবশ্য কর্তব্য।

[ইয়ং ইণ্ডিয়া, ২৮-৫-'২৫]

চরকায় সুতা কাটার কাজ সবচেয়ে বড় শিল্প, যেহেতু এই কাজে কোটি কোটি লোকের বুদ্ধি কৌশল ও শ্রমের প্রয়োজন আছে। আমাদের দেশের কোটি কোটি জনতার জন্য এই কাজ তাহাদের হাতের কৌশল ও বুদ্ধির চর্চার সুযোগ ঘটাইয়া আরও বুদ্ধি বাড়াইবে। তাহাদের মনুষ্যত্বের বিকাশের জন্য এর চেয়ে অল্প ব্যয়ে শিক্ষার অন্য কোন উপায় আবিষ্কার করা সম্ভব নয়। এই উপায় সস্তা বলিতেছি, কারণ ইহাতে প্রথম হইতেই আয় হইতে থাকে। যদি আমরা ভারতের সকল লোককে শিক্ষিত করিতে চাই তাহা হইলে তাহাদের অক্ষর-জ্ঞান শিক্ষার ব্যবস্থা পরে করিয়া প্রথমেই এই সুতা কাটা শিক্ষা দিতে হইবে। সেই সঙ্গে সুতার আনুষঙ্গিক সকল বিদ্যা শিখাইতে হইবে। যখন এই কাজে বালক-বালিকার হাত ও চোখ শিক্ষিত হইয়া যাইবে তখন তাহার আক্ষরিক শিক্ষা আরম্ভ করার সময় হইল বুঝিতে হইবে। আমি অবগত আছি যে, আমার এ প্রস্তাব অনেকেই একেবারে অবৈজ্ঞানিক

বলিয়া উড়াইয়া দিবেন, আবার কেহ কেহ বলিবেন এরূপ শিক্ষা ব্যবস্থা ঘটানো অসম্ভব। কিন্তু যাঁরা এই রকম বলিবেন আমাদের দেশের কোটি কোটি নিরক্ষর দরিদ্র লোকদের সম্বন্ধে তাঁহাদের কোন অভিজ্ঞতা নাই। ভারতের কৃষিজীবী জনতার কোটি কোটি সন্তানদের শিক্ষিত করিতে কি ব্যবস্থা হইতে পারে তাহাও তাঁহারা ভাবেন নাই। আমি ইহাও বুঝি যে এইরূপ শিক্ষা ব্যবস্থা প্রচলিত করিতে হইলে যে শিক্ষিত সম্প্রদায় ভারতের রাজনৈতিক জাগরণ আনিয়াছেন তাঁহাদের শ্রমের মর্যাদা বোঝা দরকার; সেই সঙ্গে যখন ভারতের প্রত্যেকটি যুবক সুতা কাটা শেখা ও গ্রামে তাহা প্রচলিত করা ধর্ম বলিয়া গ্রহণ করিবে তখনই এই শিক্ষা ব্যবস্থা চালু হওয়া সম্ভব।

[ইয়ং ইণ্ডিয়া, ৯-৯-'২৬]

যতই আমি গ্রামের ভিতরে ঘুরিতেছি ততই গ্রামের বাসিন্দাদের ভাবলেশহীন দৃষ্টি আমার মনকে পীড়িত করিয়া তুলিতেছে। বলদের পাশাপাশি মাঠে কাজ করিতে করিতে তাহারাও ক্রমে বলদের অবস্থায় আসিয়া পৌছিয়াছে—এর বাইরে তাহাদের কোন কাজ নাই। ইহাই সবচেয়ে দুর্ভাগ্য যে, কোটি কোটি লোক হাতকে হাতের মত ব্যবহার করা ভুলিয়া গিয়াছে। প্রকৃতি মানুষকে যে শক্তি, যে কুশলতা দিয়াছিলেন, তার এই অমানবোচিত অব্যবহারের ফলে আজ সুকঠিন প্রতিশোধ লইতেছেন। আমরা প্রকৃতির এই দানের যথাযোগ্য

ব্যবহার করিতেছি না। অথচ যে সকল গুণ মানুষকে পশু হইতে পৃথক্ করিয়াছে তার মধ্যে মানুষের হাতের এই অপূর্ব কুশলতা অন্যতম। কোটি কোটি লোক আজ হাত দুটিকে পায়ের মত ব্যবহার করিতেছে, যার জন্য আমরা প্রকৃতির আশীর্বাদ পাইয়াও বঞ্চিত হইয়া আছি। দেহে ও মনে উভয়তঃ আমরা কাঙাল হইয়াছি।

একমাত্র চরকাই আমাদের এই অকরুণ অপচয় রোধ করিতে পারে। এই কাজ এই মুহূর্তেই আরম্ভ করা যায়—যার জন্য বেশী কিছু অর্থ বা বুদ্ধি খরচ করিবার প্রয়োজন হয় না। আমাদের বর্তমান দুরবস্থার ফলে আমাদের জীবনের গতি রুদ্ধ হইয়া মৃতকল্প হইয়া আছি। আবার প্রাণের গতি ফিরাইয়া আনিতে পারে এই চরকা—যদি আমাদের প্রতিটি গৃহে চরকা চলে এবং সমগ্র গ্রামকে একটি কাপড়ের কারখানায় পরিণত করিতে পারি। এই কাজ চালু করিলে গ্রামীণ শিল্পের পুনরভ্যুত্থানের সঙ্গে সঙ্গে গ্রামীণ সঙ্গীত ও গ্রাম্য কলা জাগিয়া উঠিবে। অর্ধাহারী জাতির জীবনে ধর্ম থাকিতে পারে না, শিল্পকলা সৃষ্টি হইতে পারে না, কোন গড়ার কাজের উপযুক্ত সংগঠনও সম্ভব নয়।

[ইয়ং ইণ্ডিয়া, ১৭-২-'২৭]

গ্রামসেবকের জীবনের কেন্দ্রে চরকার স্থান। খাদির বৈশিষ্ট্য এই যে, ইহা কৃষিকার্যের পরিপূরক এবং কৃষি-জীবনের সঙ্গে একই ছন্দে চলিতে পারে। চরকা তখনই নিজ আসনে

সুপ্রতিষ্ঠিত হইল বলা যাইবে যখন গ্রাম হইতে কর্মবিমুখতা দূর হইবে, এবং যখন গ্রামের প্রত্যেকটি গৃহ কর্মচঞ্চলতায় মুখরিত হইয়া উঠিবে।

গ্রামীণ কর্মী শুধু নিয়মিত চরকাই কাটিবেন না, তাঁর জীবিকার জন্য তাঁকে কাঠের কাজ, চাষের কাজ, চামড়ার কাজ ইত্যাদি যে কাজে তাঁর সুবিধা হয়, তাহাতে খাটিতে হইবে। দিবারাত্রে আট ঘণ্টা বিশ্রাম ও ঘুমের সময় বাদে বাকী সকল সময় তিনি কাজে ব্যাপৃত থাকিবেন। নষ্ট করিবার মত সময় তাঁর থাকিতে পারে না। তিনি নিজে আলস্য বর্জন করিবেন এবং অপরকেও অলস হইতে দিবেন না। তাঁর আনন্দ, নিরবচ্ছিন্ন কর্মপ্রচেষ্টা গ্রামের লোককে কাজে উৎসাহিত করিবে। আমরা বাধ্য হইয়া বা ইচ্ছাপূর্বক যে অলস জীবন যাপন করি তাহার অবসান ঘটাইতে হইবে। নচেৎ কোন উপায়েই এই দুরবস্থা ঘুচিবে না, এই অর্ধাশনে বাঁচিয়া থাকার সমস্যা চিরকালই রহিয়া যাইবে। যিনি দুই মুঠা অন্ন গ্রহণ করিবেন তিনি চার মুঠা জন্মাইবেন। যদি এই নীতিতে লোকের আস্থা না থাকে তাহা হইলে লোকসংখ্যা যতই কমুক না কেন সমস্যা সমস্যাই রহিয়া যাইবে। যদি এই নীতি অনুসারে চলিতে পারি তাহা হইলে দেশের সকল লোকের এমনকি আরও যদি কিছু বাড়ে তাহাদেরও কর্মসংস্থান ও অন্নসংস্থান হইবে।

এই কারণেই বলিতেছি, গ্রামসেবককে শ্রমের মূর্তরূপ গ্রহণ করিতে হইবে।

[হরিজন, ৩১-৮-'৩৪]

একাদশ পরিচ্ছেদ

আশ্রমে শ্রম-যজ্ঞের সাধন

টলস্টয়ের লেখা (অন্ন-শ্রমের তত্ত্ব) আমার মনে গভীর রেখাপাত করিয়াছিল, ফলে দক্ষিণ আফ্রিকায় থাকা কালীন তাঁহার আদর্শে চলিবার সাধ্যমত চেষ্টা করিয়াছি। সেখানে আশ্রম প্রতিষ্ঠিত হওয়ার সময় হইতেই এই অন্ন-শ্রমের সাধনাই ছিল উহার বৈশিষ্ট্য।

দিনের মধ্যে কয়েক ঘণ্টা কাল দৈহিক শ্রমই ছিল একমাত্র কাজ, কাজেই সকলকে কাজে লাগিয়া থাকিতে হইত। কর্মীদের মধ্যে কেহ অকুশলী, আলস্যপরায়ণ অথবা অস্থিরচিত্ত হইলেও তাহাকে ওই কয় ঘণ্টা কাজে লাগিয়া থাকিতেই হইত। আবার কতকগুলি কাজ আছে যাহার ফল সঙ্গে সঙ্গেই পাওয়া যায়, কাজেই অনিচ্ছুক কর্মীরাও বেশী সময় নষ্ট করিতে পারিত না। যে প্রতিষ্ঠানে শরীরশ্রম কার্যতালিকার একটি মুখ্য অঙ্গ বিবেচিত হয়, সেখানে ভৃত্যের বাহুল্য থাকে না। কর্মীদের করণীয়ের মধ্যে জল তোলা, কাঠ কাটা, বাতি পরিষ্কার করিয়া তেল ভরা, পায়খানা পরিষ্কার করা, রাস্তাঘাট বাড়ীঘর পরিষ্কার রাখা, নিজের নিজের কাপড় কাচা, রান্না করা ইত্যাদি কাজ করিতেই হইবে।

এই সকল কাজ ছাড়া আশ্রম-ধর্ম পালনের জন্য আরও অনেক কাজ, আশ্রমবাসীদের না করিয়া উপায় ছিল না—

যেমন, চাষের কাজ, গোপালন ও দুগ্ধদোহন, তাঁতের কাজ, ছুতারের কাজ, চামড়ার কাজ ইত্যাদি।

এই সকল কাজের ফর্দ দেখিলেই বুঝা যায় আশ্রমবাসীরা অন্নের জন্য যথেষ্ট পরিমাণ শ্রমই করিয়া থাকেন। কাজেই অন্ন-শ্রমের ত্রুটি হয় না এ কথা বলা যায়। কিন্তু এই যজ্ঞের আর একটি দিক হইল অপরের সেবা করা। লক্ষ্য করিলে দেখা যাইবে, হয়ত আশ্রম এই ব্রতের সাধনে পিছাইয়া আছে। তবে আশ্রমের আদর্শ হইল, সেবার জন্য বাঁচিয়া থাকা। এইরূপ একটি প্রতিষ্ঠানে আলস্যের কোন স্থান থাকিতে পারে না, কর্তব্য পালনে কোন অবহেলা চলিবে না, সবকিছু সম্পাদন করিতে হইবে পূর্ণ উৎসাহে কল্যাণবুদ্ধিতে উদ্বুদ্ধ হইয়া। যদি এই ধর্ম সম্যক্ প্রতিপালন করা হয় তাহা হইলে আশ্রম পরিচালনা যে পরিমাণ সফল হইয়াছে তার চেয়ে অনেক বেশী সার্থক হইত। কিন্তু আমরা পূর্ণ সার্থকতা হইতে এখনও অনেকখানি পিছাইয়া আছি। এই কারণে যদিও আশ্রমের সকল কাজই শ্রম-যজ্ঞের অঙ্গ বলিয়া বিবেচিত, তাহা হইলেও দরিদ্রনারায়ণের নামে প্রত্যহ একঘণ্টা সূতা কাটা অবশ্যকর্তব্য বলিয়া মনে করিতে হইবে।

অনেকে বলিয়া থাকেন যে, এইরূপ আশ্রমের মত প্রতিষ্ঠান যেখানে শরীরশ্রমকে এইরূপ প্রাধান্য দেওয়া হয়, সেখানে বৌদ্ধিক উন্নতির সম্ভাবনা থাকে না। কিন্তু অভিজ্ঞতায় ইহার বিপরীতই দেখিয়াছি। আশ্রমে যত লোক আসিয়াছে তাহাদের বুদ্ধির উন্নতি হইতেই দেখিয়াছি, এমন একজনও

পাই নাই, আশ্রমে কিছুকাল বাস করিয়া যাহার বুদ্ধির অবনতি হইয়াছে।

পৃথিবীর নানা বিষয়ের তথ্য সংগ্রহ করাকেই সাধারণতঃ লোকে বুদ্ধির উন্নতি বলিয়া থাকে। আমি মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করি যে, আশ্রমে ছাত্রদের এইরূপ জ্ঞানবৃদ্ধির জন্য বেশী চেষ্টা করা হয় না। কিন্তু বুদ্ধির চর্চা বলিতে যদি বোধ ও বিচারশক্তির চর্চা বুঝায়, তাহা হইলে তাহার জন্য আশ্রমে প্রভূত ব্যবস্থা বর্তমান রহিয়াছে। যেখানে শ্রমের পরিবর্তে মজুরি নেওয়া হয়, সেই ক্ষেত্রে শ্রমকারী নিরুদ্যম ও অমনোযোগী হইতে পারে। এইক্ষেত্রে শ্রমিককে কেহ বলে না কেমন করিয়া বা কেন কাজ করা হইতেছে, তাহারও কোন আগ্রহ থাকে না ; ফলে সে কাজে কোন উৎসাহ পায় না। কিন্তু আশ্রমে কাজের অবস্থা এরূপ নয়। এখানে পায়খানা পরিষ্কার হইতে আরম্ভ করিয়া সবকিছু কাজ উৎসাহের সহিত, বিবেচনা সহকারে, ভগবানের সেবা বোধে সম্পন্ন করিতে হয়। এই কারণে আশ্রমের সকল কাজে বুদ্ধির চর্চা ও বিকাশের অবকাশ থাকে। প্রত্যেক কর্মীকেই নিজ নিজ কাজ সম্বন্ধে সম্যক্ জ্ঞান অর্জন করিতে উৎসাহ দেওয়া হয়। যদি কেহ ইহাতে অবহেলা করে তাহার কাজের কৈফিয়ৎ তাহাকে দিতে হয়। আশ্রমে সকলেই কর্মী, কেহই মজুরীর জন্য খাটে না।

কেবল বই পড়িয়া জ্ঞান অর্জন করা যায় এই যুক্তিকে ঘোর কুসংস্কার বলিতে হইবে। এই ভ্রান্ত ধারণা আমাদের

পরিত্যাগ করা উচিত। জীবনে বই পড়ারও স্থান আছে, সেই ক্ষেত্রেই পড়াশুনায় উপকার হয়। কিন্তু যদি পুঁথিগত বিদ্যার জন্য শ্রম বর্জন করা হয় তাহা হইলে এই সংস্কারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করাই উচিত। সময়ের অধিকাংশই শরীর-শ্রমে ব্যয় করিয়া কিছু সময় পড়াশুনা করাই শ্রেয়ঃ। ইহার প্রয়োজনীয়তা আরও উপলব্ধি করা যায় যখন আমরা দেখি যে, আমাদের দেশের ধনী এবং যাঁহাদের উচ্চবর্ণের লোক বলা হয় তাঁহারা শরীরশ্রমকে অবজ্ঞা করেন। এইজন্যই শরীর-শ্রমের উপযুক্ত মর্যাদা দাবী করা দরকার। ইহা সত্য যে সত্যকার বৌদ্ধিক উন্নতির জন্যও কোন না কোনরূপ হিতকারী শ্রম সাধন করা আবশ্যক।

[আশ্রমনীতির প্রয়োগ, ১৯৫৫ সংস্করণ]

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

কাজ না করিলে আহার পাওয়া উচিত নয়

ভারতের নিঃস্ব বেকারদের জন্য আমার ভালোবাসার শক্তিতে আমি নিষ্ঠুরের মত ইহাই কামনা করি যে, তারা হীন ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন না করিয়া বরং উপবাসে দিনাতিপাত করুক। আমার অহিংসা ধর্মই আমাকে শিখাইয়াছে যে, উপযুক্ত পরিশ্রম ছাড়া কাহাকেও খাওয়ানো উচিত নয়। যদি আমার সাধ্য থাকিত তাহা হইলে আমি যে সকল সদাব্রত প্রতিষ্ঠানে বিনামূল্যে মানুষকে খাওয়ানো হয় সেগুলি বন্ধ করিয়া দিতাম। এই রীতি আমাদের জাতিকে ছোট করিয়া দিয়াছে, আলস্য, শ্রমবিমুখতা, ভণ্ডামি, এমনকি বহু জঘন্য অপরাধের প্রশ্রয় দিতেছে। এরূপ অপাত্রে দানের প্রথা দেশের কি ঐহিক কি পারত্রিক কোন সম্পদই বাড়াইতে পারে নাই, বরং দাতার মনে মিথ্যা অহমিকার সৃষ্টি করিয়াছে।

এর চেয়ে যদি দাতারা এমন সব প্রতিষ্ঠান গড়িতেন, যেখানে উপযুক্ত মেহনত করিলে স্ত্রী-পুরুষ নির্বিশেষে সকলেই সুষ্ঠু ভাবে আহার পায়, তাহা হইলে কত সুন্দর ও সুবিবেচনার কাজ হইত। আমার মতে সেখানে সুতা কাটা এবং ওই কাজে তুলা লইয়া যে প্রক্রিয়াগুলির প্রয়োজন হয়, সেই সব কাজ খুবই উপযোগী হইবে। যদি কেহ অন্য কাজ নির্বাচন করেন তাহাতেও বাধা নাই, কেবল এই নীতি মানিতে হইবে "কাজ না করিলে আহার পাওয়া যাইবেনা।" প্রত্যেক শহরেই

ভিক্ষুক লইয়া জটিল সমস্যা রহিয়াছে—এ সমস্যা সৃষ্টি করিয়াছেন ধনী সম্প্রদায়। অলস ব্যক্তিদের বিনা কাজে আহার দিতে কোন কষ্টই করিতে হয় না, কিন্তু যথাযোগ্য পরিশ্রমের পর খাইতে দেওয়ার ব্যবস্থার প্রতিষ্ঠান গড়িয়া তোলা অনেক বেশী শ্রমসাধ্য। ব্যয়ের দিক দিয়া বিচার করিলে কাজ করাইয়া খাইতে দেওয়ার ব্যাপারে নির্বিচারে অন্ন বিতরণ করার চেয়ে প্রথম অবস্থায় খরচ বেশীই হইবে। কিন্তু ইহা বুঝা কঠিন নয় যে, যেরূপ দ্রুতগতিতে বেকারের দল দেশ ছাইয়া ফেলিতেছে, অদূর ভবিষ্যতে এইরূপ প্রতিষ্ঠান সমাজের অপব্যয় রোধ করিয়া ব্যয়সংকোচ ঘটাইবে।

[ইয়ং ইণ্ডিয়া, ১৩-৮-'২৫]

ভিক্ষাবৃত্তিকে উৎসাহ দেওয়া অন্যায় ইহা স্বীকার করিলেও ভিক্ষুককে কাজ ও আহার না দিয়া ফিরাইয়া দিতে পারি না। কিন্তু যদি সে কাজ করিতে না চায় তাহা হইলে আহার না দিয়াই তাহাকে বিদায় দিতে আমার বাধিবে না। যাহারা অন্ধ বা পঙ্গু তাহাদের প্রতিপালন করিবে রাষ্ট্র। কারণ নকল অন্ধত্বের দোহাই দিয়া, এমনকি আসল অন্ধত্বের অজুহাতে, বহু রকমের বঞ্চনা চলিয়াছে। বহু অন্ধ ভিক্ষুক নানা অসৎ উপায়ে ধন সঞ্চয় করিয়াছে। এরূপ ব্যক্তিদের আশ্রয় দিবার উপযুক্ত প্রতিষ্ঠান থাকিলে এইরূপ অসৎ প্রলোভনের হাত হইতে তাহাদের রক্ষা পাওয়ার উপায় থাকে।

[হরিজন, ১১-৫-'৩৫]

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ
ভৃত্যের সহায়তা

অতি প্রাচীন কাল হইতেই সংসারের কাজ করিবার জন্য ভৃত্য নিযুক্ত করার প্রথা বর্তমান আছে। কিন্তু যুগে যুগে ভৃত্যের প্রতি প্রভুর আচরণের পরিবর্তন ঘটিয়াছে। কখনও বা ভৃত্যকে পরিবারভুক্ত লোক বলিয়া গণ্য করা হইয়াছে, কখনও বা তাহাকে ক্রীতদাসের মত বা প্রভুর সম্পত্তির মত গণ্য করা হইয়াছে। ভৃত্যের প্রতি প্রভুর মনোভাব যত রকম হইতে পারে উপরোক্ত দুই প্রকার মনোভাবের মাঝামাঝি সেগুলির স্থান।

আধুনিক যুগে ভৃত্যের চাহিদা অত্যন্ত বাড়িয়া গিয়াছে, যার ফলে ভৃত্যেরা নিজেদের কদর বুঝিয়া সেইমত বেতন ও কাজের সর্ত নির্দিষ্ট করিবার চেষ্টা করিতেছে। এই দাবীর সহিত যদি তারা তাদের কর্তব্য বুঝিয়া লইয়া তাহা পালন করিতে চেষ্টা করিত তাহা হইলে সম্পর্ক মধুর হইত। কিন্তু এরূপ ঘটিলে তাহারা আর ভৃত্য না থাকিয়া পরিবারের লোক হইয়া যাইত। কিন্তু প্রচলিত হিংসাবুদ্ধিতে লোকে বল-প্রয়োগই বিশ্বাস করে। এই মত অনুযায়ী চলিলে ভৃত্যেরা কেমন করিয়া পরিবারভুক্ত হইতে পারিবে? এই প্রশ্নের সমাধানের প্রয়োজনীয়তা রহিয়াছে।

আমার মতে, যে ব্যক্তি অন্যের সাহায্য কামনা করে বা অন্যকে সাহায্য করিতে চায় তাহার পক্ষে ভৃত্যের উপর নির্ভর

করা উচিত হইবে না। ভৃত্য যখন দুষ্প্রাপ্য তখন যদি কেহ ভৃত্য নিযুক্ত করিতে চায় তাহা হইলে ভৃত্য যে বেতনে ও যে সর্তে কাজ করিতে চাহিবে তাহাতেই প্রভুকে রাজী হইতে হইবে। ফলে অবস্থা এরূপ হইবে যে, ভৃত্যই প্রভুর মালিক হইয়া দাঁড়াইবে। ইহা প্রভু বা ভৃত্য কাহারও পক্ষে মঙ্গলজনক নয়। কিন্তু দাসত্ব না চাহিয়া কেহ যদি অপরের সাহায্য প্রার্থনা করে তাহা হইলে শুধু নিজেরই উপকার হইবে না—যার সাহায্য লইবেন তাহারও উপকার করা হইবে। এই নীতি বিস্তৃত ক্ষেত্রে প্রয়োগ করিলে আমাদের পরিবার বলিতে আমরা সকলকেই বুঝিব এবং অপরের সহিত সম্পর্কেরও অনুরূপ পরিবর্তন ঘটিবে। এই আদর্শে পৌঁছাইতে হইলে ইহাই একমাত্র পথ।

যাহারা এই ধর্ম প্রতিপালন করিতে চাহেন তাঁহাদের চেষ্টা ছোট ছোট ব্যাপারে প্রয়োগ করিয়া আরম্ভ করিতে হইবে। কাহারও যদি সহস্র লোকের উপর কর্তৃত্ব থাকে তথাপি তাহার এমন সংযম ও আত্মসম্মান বোধ থাকিবে যাহার বলে তিনি সম্পূর্ণ আত্মনির্ভর থাকিবেন। যাঁর এই মনোভাব থাকিবে তিনি কখনও কোন লোককে ভৃত্য জ্ঞানে আদেশ করিবেন না। তাঁকে ভুলিয়া যাইতে হইবে তিনি অধীনস্থ ভৃত্যদের উপরে প্রভু হইয়া বসিয়া আছেন—সকলকে সমকক্ষ জ্ঞানে আচরণ করিতে হইবে। বস্তুতঃ অন্যে যাহা পায় না তাহা কামনা করাও তাঁহাকে ত্যাগ করিতে হইবে।

[হরিজন ; ১০-৩-'৪৬]